মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

জামালপুর জামে মসজিদ। জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ নামে পরিচিত। এটি ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার শিবগঞ্জহাটে অবস্থিত। মসজিদের প্রবেশমুখে বেশ বড় সুন্দর একটি তোরণ রয়েছে। মসজিদের উপরে বড় আকৃতির তিনটি গম্বুজ আছে। গম্বুজের শীর্ষদেশে কাচ পাথরের কারুকাজ করা আছে। এই মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মিনারগুলো নকশা করা। মসজিদের ছাদে মোট আটাশটি মিনার আছে। একেকটি মিনারের উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। পুরো মসজিদটির ভিতরে ও বাইরের দেয়ালগুলোতে প্রচুর লতাপাতা ও ফুলের নকশা রয়েছে।

শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সমাধি। মুঘল যুগের সর্বপ্রথম সমাধি স্থাপত্য নিদর্শন বলে বিবেচিত এই সমাধিটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩৫ কিমি. দূরে শিবগঞ্জ উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী দীর্ঘদিন তৎকালীন গৌড়ে সুনামের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করে ফিরোজপুরেই ১০৭৫ হিজরি (১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে) মতান্তরে ১০৮০ হিজরিতে (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) সমাধিস্থ হন। উঁচু ভিটের উপর দন্ডায়মান এ সমাধিটি বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। প্রত্যেক দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশপথ সন্নিবেশিত হওয়াতে এ মাজার শরিফকে বারদুয়ারী বলা হয়।

নবীন

ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

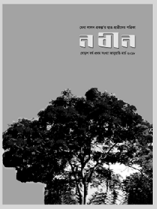

সূ চি প ত্র

বাঙালি জাতিসত্তার চেতনায় ভাষার মাস ২
যেন ভুলে না যাই তাঁদের ৩
একটি সেতু বদলে দেবে দেশ ৫
উপকার কর এবং উপকৃত হও ৭
অংকুর ৯
উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা
চ্যালেঞ্জ অর্থনীতির ভিত মজবুত করা ১০
সাজেক যেন মেঘ পাহাড়ের পথ ১২
গুগল ম্যাপের ৫টি চমৎকার ব্যবহার! ১৪
দুর্ভিক্ষ ও জয়নুল ১৬
চলে গেলেন 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' ১৮
সময় এখন নারীর ১৯
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
ও মানব উন্নয়ন ২০
অংকুর ২২
বিসিএস : লিখিত পরীক্ষা : ১ম পর্ব ২৩
আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের জন্য
বিদেশি ৫টি জনপ্রিয় স্কলারশিপ! ২৫
ফাউন্ডেশন সংবাদ ২৭
প্রকল্প সংবাদ ২৮
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

বাঙালি জাতিসত্তার চেতনায় ভাষার মাস

শেষ হয়ে আসছে ভাষার মাস। এই ফেব্রুয়ারি মাসটি নানা কারণে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে যেগুলো উল্লেখ না করলেই নয়, তার মধ্যে অন্যতম ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল, মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত 'আওয়ামী লীগে'র কাউন্সিল অধিবেশন। তবে এর গুরুত্ব ছিল অন্যখানে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ৯৮% স্বায়ত্তশাসন পেয়েই গেছে, অর্থাৎ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন অস্বীকার করেন এবং আমেরিকার আনুকূল্যে গিয়ে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির বিপক্ষে অবস্থান নেন, তখনই এই ফেব্রুয়ারি মাসেই এই কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়। মূলত, এই সম্মেলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ১৯৮৩ সালের ১৪ তারিখে, স্বৈরাচারী সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান দিলোয়ার ও দীপালীসহ কয়েকজন। এখন অবশ্য আমদানিকৃত তথাকথিত 'ভালোবাসা দিবস'-এর ফূর্তির আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে সেই আত্মদানের ইতিহাস। এই মাসের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে, ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা, ১৯৯১-এর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা, ২০০৯ সালের রক্তাক্ত কলঙ্কিত পিলখানা হত্যাকাণ্ড। তবে সব ছাপিয়ে ফিরতে হয় একুশে ফেব্রুয়ারির বিষয়ে। আগেই অন্য পর্বে বলেছি যে, রাজনৈতিক নেতাদের চোখে এটা ছিল হঠকারিতা। এর পেছনে মূল কারণ ছিল চেতনাগত। মাত্র ৫ বছর আগে মুসলিম লীগ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা নেতাদের কাছে, পাকিস্তান জাতিসত্তার ভুঁই ফুঁড়ে বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণ মেনে নেওয়া তাদের জন্যে কঠিন ছিল বৈকি? যে কারণে কাগমারি সম্মেলনের প্রয়োজন হয়েছিল।

যারা হইতো এই দেশেরই জিন্না লিয়াকত
বাইছা বাইছা মারলো রে সেই জাতির ভবিষ্যৎ।

এটা আমার রচিত নয়। একুশের রক্তাক্ত আন্দোলনের পর শোকগাথা লিখতে গিয়ে এক চারণকবি রচিত দীর্ঘ গানের এটি ছিল একটি অন্তরা। এখন অবশ্য এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় বাদ দিয়েই গানটি গাওয়া হয়। এ থেকে একটা কথা বোঝা যায়, শুধু নেতারাই নন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও নেতার প্রতীক হিসেবে ছিল জিন্নাহ (পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ) ও লিয়াকত (পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান)।

কিন্তু ঘটনার শুরু তো এখান থেকে নয়, ১৯৪৭-এর আগে থেকে। যখন প্রস্তাব উঠেছিল সংযুক্ত বাংলার স্বাধীনতার। এই আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। বাঙালি মুসলমান সেটাই চেয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, জিন্নাহ সাহেবও বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু জাত-পাতের কঠিন বিভাজনের মাথা ব্রাহ্মণদের কাছে এটা ছিল কল্পনাতীত। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কট্টর সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণের কাছে বাংলার স্বাধীনতার চেয়ে হিন্দির গোলামি করা ছিল অনেক শ্রেয়। তারই প্ররোচনায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন হয়ে ওঠে মন্দিরকেন্দ্রিক। এটা ছিল মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার সক্রিয় ও সফল প্রয়াস। আর এর একমাত্র কারণ ছিল, যুক্ত বাংলা স্বাধীন হলে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যেতো। সে সময় যুক্তবাংলা স্বাধীন হওয়ার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাদের প্রাণনাশের আহ্বান জানিয়ে কুৎসিত গালি সংবলিত পোস্টারিং হয়েছে কলকাতার রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে।

সে যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদ বাবু গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, এটা বাঙালি বর্ণহিন্দুদের জন্যে ক্ষতিকর। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনও বিবাদ ছিল না। কারণ, সমগ্র ইংরেজ আমলজুড়েই এই হিন্দু-মুসলমান ছিল বর্ণহিন্দুদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত। সেই জন্যেই শ্যামাপ্রসাদ ধর্মকে সামনে টেনে এনে বিভাজন সৃষ্টিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে সার্থক হন। কিন্তু বাঙালি মুসলমান যখন দেখলেন যে যুক্তবাংলা স্বাধীন হওয়া আর সম্ভব নয়, তখন নিরুপায় হয়েই তারা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতের সঙ্গে যে থাকা সম্ভব নয়, তা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়ই, রবীন্দ্রনাথসহ সমগ্র শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর প্রবল বিরোধিতা থেকেই তারা বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদের শিক্ষার পথ তারা রুদ্ধ করে রাখতে চান। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও তাকে নানাভাবে পঙ্গু করে রাখা হয় বহুদিন। অতএব পূর্ববঙ্গ ভারতভুক্ত থাকলে মুসলমানেরা কখনোই আত্মপরিচয়ে দাঁড়াতে যে পারত না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

১৯৪৭এ পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানদের পাকিস্তানভুক্ত হওয়াকে যারা ভুল মনে করেন, তাদের ভণ্ডামি দেখলে হাসি পায়। ১৯৪৭ এদেশের মানুষের জন্যে আশীর্বাদ হয়েই এসেছিল। তবে সেটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হওয়ার জন্যেই নয়। বরং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান থাকার কারণে। এই ব্যবধানের জন্যেই, করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদের সংস্কৃতি আমাদের ওপর সরাসরি কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি। এখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে যেমন পশ্চিমপাকিস্তানি প্রভাবমুক্ত হয়ে, তেমনি কলকাতার প্রভাবকেও অস্বীকার করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০, মাত্র এই ২২-২৩ বছরে, বিস্ময়করভাবে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিরা যেমন এই মাটি থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, তেমনি বিকশিত হয়েছে গদ্যসাহিত্যও। চারুকলায়, শিল্পকলায়, নাটকে অর্থাৎ সৃজনশীলতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে এক স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পূর্ণ উত্থান। ভাষার জন্যে আন্দোলন তাই এই বঙ্গেই জাতিসত্তার চেতনা নিয়ে সূচিত ও সম্পূর্ণ হতে পেরেছে।

দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতা হওয়ার পরও সেখানে কেন ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হতে পারেনি, তার কারণ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, ভারতীয় বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূরত্ব আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য কতটা সহায়ক হয়েছিল।

ভারতীয় জাতিসত্তা নয়, পাকিস্তানি জাতিসত্তা নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিসত্তাতেই আমাদের আজকের অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা। যার উন্মেষ ঘটেছিল ১৯৪৮ সালে, বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান
কবি ও কলামিস্ট
কালের কণ্ঠ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

যেন ভুলে না যাই তাঁদের

নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধারাই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। সব শ্রেণির, বর্ণের ও ধর্মের মুক্তিযোদ্ধার জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা তাঁদের বর্তমানকে বিসর্জন দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে কেউ সশরীরে ফিরে এসেছেন, কেউ বা হারিয়েছেন এক বা একাধিক অঙ্গ। আবার অনেকেই ফিরতেই পারেননি। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলাদেশের মাটিকে করেছেন উর্বর। অনেক মা-বোন তাঁদের ইজ্জতের বিনিময়ে প্রতিরোধ করেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের। লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরা হারিয়ে গেছেন চিরদিনের জন্য। সবাই কি পারেন প্রয়াত ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মতো মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা সেভাবে আজও আমরা লিপিবদ্ধ করে উঠতে পারিনি। শুধু সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধে যেতে দিয়েছেন, সেটিই পুরো সত্য নয়। কত মুক্তিযোদ্ধাকে নিজের সন্তান মনে করে বৈরী ওই সময়ে আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার মুখে তুলে দিয়েছেন, সেসব কথা আজও আমরা তুলে ধরতে পারিনি। কত প্রাণ হয়েছে বলিদান বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে। নৌকায় করে যুদ্ধ করার সময় মাঝিসহ কত নাম না-জানা মুক্তিযোদ্ধার সলিলসমাধি ঘটেছে, সে খবর আমরা কতটাই বা জানি। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, উপশহর, গঞ্জ, বন্দরের আশপাশে হানাদার পাকিস্তানিরা অসংখ্য বধ্যভূমি তৈরি করেছিল। শেরপুর জেলায় নালিতাবাড়ীর বিধবার গ্রামের মতো অসংখ্য জনপদে হাজার হাজার শহীদের দেহ পড়ে আছে ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়েই। বিপুলসংখ্যক বিধবার জন্য সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে নিয়মিত সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে উপস্থিত হয়েছিলাম ওই গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন মতিয়া আপা ও খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। কত প্রাণ হারিয়েছে বাংলা মা উদ্বাস্তুশিবিরে কিংবা নিরাপদ সীমান্তের ওপারে যাওয়ার পথে, তার কি সঠিক হিসাব আমরা জানি? কয়েক দিন আগে রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য নীলফামারী গিয়েছিলাম। ফেরার পথে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সঙ্গে দেখা হলো। গণহত্যা জাদুঘরের পক্ষে একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য তিনি দিনাজপুরে গিয়েছিলেন। তিনি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানালেন। বললেন, স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা করে জানা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের আনাচকানাচে যত গণকবর ও বধ্যভূমি রয়েছে, গ্রামগঞ্জে যত প্রাণ শহীদ হয়েছে, সেসবের সত্যিকার হিসাব আমরা এখনো জোগাড় করে উঠতে পারিনি। পুরো চিত্র পেলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। আমি তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিষয়ে আমি গবেষণা করে দেখেছি যে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তের সন্তানরা কী হারে নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। আমারই এক জরিপে ধরা পড়েছে যে ৮০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন বয়সে তরুণ ও কৃষকের সন্তান। একেবারে সাধারণ মানুষের সন্তানরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দলে দলে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন। আবার অনেকে দেশের ভেতরেই কাদেরিয়া বা হেমায়েত বাহিনীতে যুক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশমাতৃকার প্রতি তাঁদের ঋণ শোধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কী ছিল বঙ্গবন্ধুর সেই হ্যামেলিনের বাঁশির সুরে?

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের চেয়েও বড় হয়ে গিয়েছিলেন। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ, ক্ষোভ, অভিমান ঢেলে আসন্ন গেরিলা যুদ্ধের পথনকশা দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। রাজনৈতিক কবিতার ভাষায়, আকারে-ইঙ্গিতে তিনি গেরিলা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি পাকিস্তান নামের নির্মম রাষ্ট্রের অধীনে বাঙালিরা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কেমন অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সেই ক্ষোভের কথা জানান। '২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস...' কথাগুলো যখন বঙ্গবন্ধু লাখ লাখ মানুষের সামনে উচ্চারণ করেন, তখন তাঁদের হৃদয় ক্ষোভে ও প্রতিবাদে ভেঙে যায়। তাঁরা আশ্বস্ত হন যখন তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমার এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' ততক্ষণে একটি ভাষিক জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন, হাজার বছরের অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের পেছনে উদীয়মান বাঙালি জাতি প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই তিনি যখন আসন্ন গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে' বলে আহ্বান জানান, তখন সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা দুই হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের সম্মতির কথা জানান। তার পরপরই যখন তিনি বললেন, '...সবকিছু–আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এর পরপরই তিনি বললেন, 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।'

এই হৃদয় নিংড়ানো কথাগুলোই বলে দেয়, কেমন করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জনমানুষের যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তম এই সংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত নিবিড় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের স্বপ্নের আদলে একটি জাতিরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর ওই আহ্বানের কারণেই। উল্লেখ্য, এই মুক্তিযুদ্ধের পাটাতন তৈরি হয়েছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সন্তানদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। মূলত পাটের উদ্বৃত্তনির্ভর পূর্ব বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্তের সন্তানরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহনেতাদের ডাকে কিভাবে আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেই দিকটি ভুললে চলবে না। এই পটভূমিতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে রূপান্তর, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ সমর্থনই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ নির্মাণের সিঁড়িগুলো তৈরি করে। এই সামাজিক সম্মতি নিয়েই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রত্যাখ্যান করে মানুষের অধিকার অর্জনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই গণ-আকাঙ্ক্ষার নির্যাসের বলেই বাঙালি জাতি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

অথচ এই নাম জানা অথবা না-জানা বীরদের আমরা কতটা মনে রেখেছি? তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণে আমরা কী করেছি? মুক্তিযুদ্ধে অঙ্গ হারিয়েছেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, তাঁদের মনে অনেক অভিমান। তাঁদের কাউকে কাউকে বিশেষ বিশেষ দিনে গণভবন বা বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ করা হলেও আরো অনেকেই রয়ে যান পর্দার অন্তরালে। এমনও দিন গেছে, যখন দেখেছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভিক্ষুক হিসেবে হাত পাততে। এখন আর সে রকম খবর পত্রিকায় বের হয় না। তাঁদের অনেককেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার পুনর্বাসন করেছে। তাঁদের নিয়মিত ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সরকারি পরিবহন ফ্রি করে দেওয়া উচিত। তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার খরচ সরকারের বহন করা উচিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি হাসপাতালে বিনা মাসুলে চিকিৎসার সুযোগ অবারিত করে দেওয়া উচিত।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় প্রতিটি গণকবর ও বধ্যভূমিকে চিহ্নিত করার কাজে হাত দিয়েছে। এই কাজে তাদের পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি। এসব গণকবর ও বধ্যভূমিকে শহীদ স্মৃতির দৃষ্টিনন্দন নিদর্শন হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। কুমিল্লা বা চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত বীরদের জন্য স্থাপিত 'ওয়ার সিমেট্রি' নিশ্চয়ই দেখেছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশন কী মমতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সিমেট্রির দেখভাল করে, তা নিশ্চয়ই দর্শকের চোখ এড়ায় না। তাহলে আমরা কেন পারব না আমাদের নাম জানা না-জানা শহীদের স্মরণে এমন দৃষ্টিনন্দন স্মৃতির মিনার ও বাগান গড়ে তুলতে? বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এরই মধ্যে বেশ কিছু জাদুঘর ও স্মৃতির মিনার গড়ে তুলেছে। অনেক সেনানিবাসেই শহীদের স্মৃতি সংরক্ষণের মমতাময় উদ্যোগের প্রশংসা করতেই হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটিও জনগণের ভালোবাসার ঠিকানা। কেউ কেউ ব্যক্তি উদ্যোগেও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে জাদুঘর ও পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। উদ্যোক্তাদের সবাইকে জানাই সালাম।

এখন সময় এসেছে সরকারি উদ্যোগে সব বধ্যভূমি ও গণকবর সংরক্ষণ করে সেখানে স্মৃতিচিহ্ন ও দৃষ্টিনন্দন বাগান গড়ে তোলার। এই বাগানে ও তার আশপাশে আমরা প্রতি শহীদের স্মরণে বছরে একটি করে গাছ লাগাতে চাই। এই গাছগুলোই হবে আমাদের সবুজ মিনার। এ কাজে সরকারকে সহযোগিতা করতে ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো সিএসআর বা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেও এগিয়ে আসতে পারে। আমি গভর্নর থাকাকালে ব্যাংকগুলোকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত করতে পেরেছিলাম। তাদের অসামান্য এই অবদান যুগ যুগ ধরে মুক্তিযুদ্ধপ্রেমী মানুষের মনে থাকবে। যমুনা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম বীরযোদ্ধা প্রয়াত বিনোদবিহারী চৌধুরীর জন্য বিশেষ ফেলোশিপ প্রদানে এগিয়ে এসেছিল। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে পরিকল্পিত উপায়ে যুক্ত করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারলে তারা নিশ্চয়ই সামাজিক দায়বোধের অংশ হিসেবে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা গণকবর ও বধ্যভূমিগুলোকে দত্তক হিসেবে নিয়ে আমাদের সবার জন্য ঐতিহ্যের অংশ করে তুলতে সহযোগিতা করতে মোটেও দ্বিধা করবে না। প্রয়োজন উপযুক্ত ডাকের। নাম জানা অথবা না-জানা শহীদের স্মৃতি চিরজীবী হোক। বাঙালি জাতির ইতিহাস সংরক্ষণে আমাদের সম্মিলিত এই দায়বোধ কিছুতেই আমরা এড়াতে পারি না।

"তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই–
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসঙ্গে আছি, একসঙ্গে বাঁচি, আজো একসঙ্গে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।"
[সৈয়দ শামসুল হক, আমার পরিচয়]

ড. আতিউর রহমান
অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
কালের কণ্ঠ ২৭ মার্চ ২০১৮

একটি সেতু বদলে দেবে দেশ

অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি–বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন এমন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা দ্রুতই বদলে দেবে দিগন্ত। এখনকার অনেক পরিকল্পনা বড় বড় স্বপ্নকে মাথায় রেখে প্রণয়ন করা। কেমন দেখতে হবে সেই ভবিষ্যৎ?

পদ্মা বহুমুখী সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতিই বদলে দেবে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে এই সেতু দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, বাণিজ্য, পর্যটনসহ অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব মিলিয়ে এই সেতু আসলেই দেশের মানুষের স্বপ্নের সেতু হয়ে উঠবে।

তবে নিজস্ব অর্থায়নে এমন একটি সেতু নির্মাণ করতে যাওয়ার কাজটি সহজ ছিল না। বহু বছর আমাদের যোগাযোগ ছিল নদীনির্ভর। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর সড়ক যোগাযোগ গুরুত্ব পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও বাধা ছিল নদ-নদী। যেকোনো সড়ক তৈরি করতে গেলেই ছোট-বড় নদী অতিক্রম করতে হতো। অনেক ফেরি চালু ছিল। আমি যমুনা সেতু নির্মাণকাজে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্ত ছিলাম ১৯৮৫ সাল থেকে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ কখনো ভাবতেই পারেনি সকালে রওনা দিয়ে দুপুরে ঢাকা পৌঁছে যাবে। আবার কাজ শেষ করে সেদিনই ফিরে আসা সম্ভব হবে। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যমুনায় বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন করা হয়। সে সময়েই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের সুবিধার জন্য পদ্মায় সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ এই সময়ে পূর্ব সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়। এরপর ২০০১ সালে জাপানিদের সহায়তায় সম্ভাব্যত যাচাই হয়। ২০০৪ সালে জুলাই মাসে জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জাইকার সুপারিশ মেনে মাওয়া-জাজিরার মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে। মহাজোট সরকার শপথ নিয়েই তাদের নিয়োগ দেয়। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার সেতু করার চূড়ান্ত নকশা করা হয়। নতুন নকশায় নিচে চলবে রেল এবং ওপরে মোটরগাড়ি।

কেন দোতলা সেতু হবে? এর সুবিধাই বা কী? আমরা ভবিষ্যতের

কথা ভেবেছি। এ পথটি ট্রান্স-এশীয় রেলপথের অংশ হবে। তখন যাত্রীবাহী ট্রেন যত চলবে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি চলবে মালবোঝাই ট্রেন। ডাবল কনটেইনার নিয়ে ছুটে চলবে ট্রেন। পদ্মায় নৌযান চলে অনেক এবং সেটাও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আমাদের সহায়তার অঙ্গীকার করে। বিশ্বব্যাংক বলে, তারা এখানে মূল দাতা হবে। জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকও ছিল। মূল সেতুর নির্মাণকাজের তদারকি কে করবে এ জন্য প্রস্তাব চাওয়া হয়। চীনা একটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা অযোগ্য মনে করি। তারা অন্য একটি সেতুর কাজ তাদের বলে চালিয়েছিল। এরপরেই পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই ঘুষের অভিযোগ ওঠে। কয়েকজন জেলে গেলেন। একজন মন্ত্রী পদ হারালেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে বলতে পারি কোনো অনিয়ম হয়নি। তবে বিশ্বব্যাংক ১২০ কোটি ডলারের অঙ্গীকার থেকে সরে যায়। এ ধরনের কাজের শর্ত অনুযায়ী মূল ঋণদাতা চলে গেলে অন্যরাও চলে যায়।

কাজেই একে একে এডিবি, জাইকা ও আইডিবিও চলে যায়।

এরপর বেশ কিছুদিন সিদ্ধান্তহীনতা চলতে থাকে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে এই সেতুটি করার কথা ওঠে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা হয়।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, মালয়েশিয়ার এত বড় কাজের অভিজ্ঞতা নেই। একসময় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতু করার কথা ওঠে। প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে জানতে চান, নিজেদের টাকায় সেতু বানালে তদারক করতে পারবেন? আমি তাঁকে বলি, সেতুর পাঁচটি কাজের মধ্যে নদীশাসন ও মূল সেতুর কাজ আমরা পারব না। দুই পাড়ের সংযোগ সড়কের কাজ, সার্ভিস এরিয়া-২-এর কাজ এগুলো আমরা করতেই পারি। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে যুক্ত করা যেতে পারে। এরপরেই এই কাজগুলো শুরু হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে সেতু ও নদীশাসনের কাজ দেওয়া হয়েছে। কাজ তদারক করার আন্তর্জাতিক ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মূল পাইলিং কাজের উদ্বোধন করে এসেছেন। আমরা গত সপ্তাহেও গিয়েছি। খুব দ্রুতগতিতেই কাজ চলছে। ২০১৮ সালেই এই সেতুতে রেল ও যান চলবে।

তবে এ ধরনের বড় সেতু করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ আছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ পদ্মা-যমুনার সম্মিলিত প্রবাহ। প্রতি সেকেন্ডে মাওয়া পয়েন্টে ১ লাখ ৪০ হাজার ঘন মিটার পানি প্রবাহিত হয়। আমাজন নদীর পরেই কোনো নদী দিয়ে এত বেশি পানি প্রবাহিত হয়। এখন নদীর যে তলদেশ, আগামী একশ বছর পর সেটা কেমন থাকবে, ভূমিকম্প প্রতিরোধে কী করা হবে–এগুলো বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আগামী একশ বছরে নদীর তলদেশের ৬২ মিটার পর্যন্ত মাটি সরে যেতে পারে। আরও ৫৮ মিটারসহ মোট ১২০ মিটার গভীরে গিয়ে পাইলিং করতে হচ্ছে। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর পদ্মা সেতু একটু বাঁকানো। কাজেই কাজটি অরেকটু কঠিন। এ ছাড়া আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ নদীশাসন। এ কাজেই ব্লকের পাশাপাশি জিয়ো টেক্সটাইলের বস্তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সেতু হলে কতটা লাভবান হব আমরা? এই সেতুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রথম কোনো সমন্বিত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন পাল্টে যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল কৃষিতে উন্নত। এই সেতু হয়ে গেলে তাদের কৃষিপণ্য খুব সহজেই ঢাকায় চলে আসবে। মংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানী এবং বন্দরনগরে চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পুরো দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে। কোনো বিনিয়োগের ১২ শতাংশ রেট অব রিটার্ন হলে সেটি আদর্শ বিবেচনা করা হয়। এই সেতু হলে বছরে বিনিয়োগের ১৯ শতাংশ করে উঠে আসবে। কৃষি-শিল্প-অর্থনীতি-শিক্ষা-বাণিজ্য–সব ক্ষেত্রেই এই সেতুর বিশাল ভূমিকা থাকবে।

পদ্মা সেতুকে ঘিরে পদ্মার দুই পাড়ে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই নগরের আদলে শহর গড়ে তোলার কথাবার্তা হচ্ছে। নদীর দুই তীরে আসলেই আধুনিক নগর গড়ে তোলা সম্ভব। তবে সে জন্য এখনই পরিকল্পনা নিতে হবে। এই সেতু ঘিরে কী কী হতে পারে, কোথায় শিল্পকারখানা হবে, কোথায় কৃষিজমি হবে–সেসব এখনই বিবেচনা করা উচিত। প্রয়োজনে এখানে প্রশাসনিক রাজধানী হতে পারে। এই সেতুকে ঘিরে পর্যটনে যুক্ত হবে নতুন মাত্রা। অনেক আধুনিক মানের হোটেল-রিসোর্ট গড়ে উঠবে। এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০৩৫-৪০ সালে বাংলাদেশ যে উন্নত দেশ হবে, সে ক্ষেত্রেও এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, স্বপ্নের এই সেতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

জামিলুর রেজা চৌধুরী
প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ
প্রথম আলো ২০ ডিসেম্বর ২০১৭

উপকার কর এবং উপকৃত হও

পরোপকারের প্রথম হকদার নিকটাত্মীয়রা। নিজের নিকটজন থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অসহায় সাহায্যপ্রার্থী সকলকে সহায়তা দানের নির্দেশ দিয়ে সুরা নিসার ৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।'

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরোপকার করা মানে হলো নিজের উপকার করা। মানুষ এককভাবে একক অবস্থানে একক ভাবনায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। একে অন্যের ওপর তাকে নির্ভরশীল হতেই হয়। সকল মানুষ সমান মেধা, শক্তি ও সামর্থের অধিকারী নয়। উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীল প্রতিভা সকলের সমান নয়–পরিবেশও সর্বত্র এক নয়। কিন্তু একে অন্যের শক্তি ও সামর্থেও ভাগাভাগিতে পরস্পরের উপকার লাভ ঘটে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের মধ্যে সুযোগের যে বিভিন্ন পর্যায় দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা সম্প্রসারণ করে সকল সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধান সন্ধান করবে এটা তার মহান শিক্ষা।

আল্লাহ নিজে এসে তার কোনো বান্দার সমস্যার সমাধান করে দেন না। কিংবা তাকে সরাসরি সহযোগিতা করেন না। তিনি তার এক বান্দার মাধ্যমে অন্য বান্দার সমস্যা সমাধানে সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। অর্থাৎ যে অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ পাবে বা যার সামর্থ আছে অন্যের সমস্যার সমাধান করার সে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। এটিই পরোপকার। এই পরোপকার প্রবৃত্তির দ্বারা ঘটে আল্লাহর সেই মহৎ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। আল্লাহর পক্ষ হয়েই অন্যের উপকার করা। এই উপকারের ফলে অপর ব্যক্তির সমস্যার সমাধান হওয়া বা করা মানে হলো ঐ ব্যক্তির সুখ-শান্তির কারণ সৃষ্টি করা। অপর ব্যক্তি সমস্যার সমাধান পেয়ে নিজে নিরাপদ ও শান্তি পেতে পারে এবং এভাবে সমাজে সকলের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে সকলে শান্তিতে ও সুখে বসবাস করতে সক্ষম হবে। সে ক্ষেত্রে হাহাকার হানাহানি কমে যাবে। আমি যদি আমার প্রতিবেশীকে অভুক্ত দেখি–কিংবা কোনো সমস্যায় আকীর্ণ দেখি অথচ আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা যদি দূর করতে উদ্যোগী না হই তা হলে ঐ প্রতিবেশী হয়ত এক পর্যায়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে এবং আমার অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যিনি অধিকাংশ মানুষের

সমস্যার সমাধান ব্রতী হন তিনি বড়ো সমাজের শান্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম।

উপকারের প্রতিদান অবশ্যই মিলে। সরাসরি না হলেও যে কোন ভাবে হোক উপকারের সুফল পাওয়া যাবেই। এটা প্রকৃতির অমোঘ বিধান। এই জগতে যত প্রাণী বসবাস করে তারা পরস্পরের সহানুভূতি সহায়তার সুযোগেই সমঝোতা ও সহাবস্থানের কারণে বসবাস করার সুযোগ পায়। প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই বোধ ও বিশ্বাসের দ্বারা মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কবির ভাষায়–

আপনার লযে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

আরবী ইহসান শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পরোপকার, সদ্ব্যবহার, ন্যায়বিচার। পরোকার মহান রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তার বান্দার প্রতি অশেষ রহমতেরই উত্তম প্রতিদান। আল-কোরআনের ২৮ সংখ্যক সুরা কাসাসের ৭৭নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 'আহসীন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা' পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দার ও সৃষ্টিকুলের প্রতি এনায়েত করেছেন অফুরন্ত নেয়ামত বা কল্যাণ। সুরা লোকমান-এর ২০নং আয়াতে বলা হয়েছে' তোমার কি দেখ না আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।' আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ভোগের ব্যাপারে মানুষের উচিত রহমানুর রাহিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অন্যতম উপায় হলো পরোপকার করা। অর্থাৎ অপরকে ও সেই নেয়ামত অর্জনে ও ভোগে সহায়তা করা। বস্তুত পরোপকারের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সহানুভূতি প্রকাশ এবং প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসার পরিবর্তে সহায়তা সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খোদা যেমন তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন তুমিও তেমন তার সৃষ্টিকুলের প্রতি সদয় বা উপকারী হও। এর ফলে যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে সেটিই আল্লাহর বিশেষ পছন্দ। আল্লাহ সদালাপী সদ্ব্যবহারকারী পরোপকারী বা মুহসিনদের ভালোবাসেন এবং তাদের জন্য রয়েছে খোদার খাস রহমত।

হাদিসে আছে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই–বান্দা বলবে আমি সামান্য বান্দা কীভাবে আমি তোমার তৃষ্ণা মিটাবো। আল্লাহ বলবেন আমার যে তৃষ্ণার্ত বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল তুমি তাকে পানি পান করালে তা আমাকে পানি পান করানো হতো। অর্থাৎ এখানে শিক্ষা এই যে, আল্লাহর বান্দাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

ইহসান বা পরোপকার মূলত বান্দার হক। সুবিচার করা, সৎ কাজে আদেশ, অন্যায় কাজ নিষেধ, সদালাপ, সদ্ব্যবহার, বিপদে-আপদে সহানুভূতি জানানো, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা-সংকট সহানুভূতি জানানো, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা-সংকট সমাধানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা সবই পরোপকারের পর্যায়ে পড়ে। আল কোরআনের ২৫ সংখ্যক সুরা ফোরকানের ৬৩ থেকে ৭৭নং আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের ১৩টি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এসব গুণের মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'কথাবার্তায় সব সময় সচেতন থাকা, সালামের জবাব দেয়া, কারো মনে আঘাত লাগতে পারে কিংবা বিরূপ ভাব ও সংক্ষোভের উদ্রেক হতে পারে এমন সংলাপ পরিহার করা। সুবচন ও সুশীল আচরণ কখনোই শত্রুতা ও বিবাদের জন্ম দেয় না।' ইসলাম অভিবাদন পদ্ধতি, সালাম দেয়া, এর মূল উদ্দেশ্যই হলো পরস্পরের প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক এই ইচ্ছা প্রকাশ বা দোয়া করা। এর অন্যতম বাহ্যিক তাৎপর্য হল পরস্পরকে এটা জানান দেয়া যে, আমরা একে-অন্যের থেকে নিরাপদ। এটি পরোপকারের একটি মৌলিক ভিত্তি বা পর্যায়।

পরোপকারের প্রথম হকদার নিকটাত্মীয়রা। নিজের নিকটজন থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অসহায় সাহায্যপ্রার্থী সকলকে সহায়তা দানের নির্দেশ দিয়ে সুরা নিসার ৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' সুরা বাকারার ৮৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–মাতা পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।' অর্থাৎ পরোপকারকে নামাজ, যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং কোনো কিছুর সাথে আল্লাহর শরীক না করার মতো কঠোর নির্দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরোপকার আসলে প্রকারান্তরে নিজেরই উপকার। সকল ধর্মেই একথা বহুল প্রচারিত যে, 'উপকার কর এবং উপকৃত হও।' কারো উপকারের দ্বারা নিজের সহায়-সম্পদের কোনো ঘাটতি হয় না; বরং অন্যের সাথে সহযোগিতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সুখকর ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাতে পারস্পরিক কল্যাণ এবং সহায়-সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ অবারিত হয়। সূরা বনি ইসরাইলের ১০০নং আয়াতে পরোপকার বা অন্যের কল্যাণ সাধনে মানুষের কৃপণ স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, (হে রাসুল) আপনি বলুন, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে, তবুও ব্যয় হয়ে যাবে, এই আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে, মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।' শিক্ষা এই, পরোপকারের প্রশ্ন মানুষের উচিত দরাজ দিল হওয়া, উদার ও উন্মুক্ত হওয়া।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব, ইআরডি ও চেয়ারম্যান, এনবিআর
মেম্বার, গভর্নিং বোর্ড, এইচডিএফ

মুক্তির স্বাদ

মোছা. আরিফা খাতুন
সদস্য ৯৮৫/২০১২

মুক্ত আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ, খুঁজে ফিরে স্বাধীনতার সঙ্গ
এ আমার লাল-সবুজের সোনার বঙ্গ।
সবুজ মাঠের বুক ছুঁয়ে যায় রক্তিম কবিতা
বর্ণগুলো হয়ে উঠে মোর বাং লা কবিতা।
লাল-সবুজের এই লুকোচুরি খেলা
বিভোর করে মোর সকাল বেলা।
পূর্ব আকাশে উদিল রক্তস্নাত রবি,
কবিতা হেতা খুঁজে পেল নবীন বাংলার কবি।
গর্জে উঠিল পতাকা হাতে, শোনিত রাঙা কর,
দিনটি ছিল ১৬ ডিসেম্বর, উনিশ'শ একাত্তর।
বিজয় নিশান ঐ বৃত্তের মাঝে,
লাল সবুজের পতাকা সাজে।
বিস্মিত আমি! সবুজ পাড়ে দাঁড়িয়ে একা একা
এই কি তবে আমার দেশের শোনিত রাঙা পতাকা।

হে আকাশ

মো. কবির মিয়া
সদস্য ০৫/২০৮৫

হে আকাশ
অগণিত শতাব্দীর নিস্তব্ধ আকাশ,
আদি সৃষ্টি ধরে দেখে যাও
পৃথিবীতে স্বার্থপর মানুষের নির্লজ্জ পদচারণ,
হিংস্র মানুষের কপটতা,
অস্ত্র দানবের কাছে মানুষের আর্ত পরাজয়,
দুর্দশার স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষের অন্তিম চাহনি।
দেখে দেখে অভ্যস্ত তুমি বিচলিত হওনি একটি বারও
অথবা ফেরাওনি উজ্জ্বল দৃষ্টি।
জগতের কত বিরহ প্রেমের ইতিহাস,
বৃথা, পাপ, অশ্রু, রুক্ষ বিমর্ষ হৃদয়,
জীবনের সাথে জীবনের অঙ্গীকার ভঙ্গ,
নিরুত্তর তুমি চেয়ে থাক অবোধ বোবার মত।
তোমার কণ্ঠে শুনিনি প্রতিবাদ
অথবা অর্ধদিবসের জন্য করোনি ধর্মঘট।
হে আকাশ,
জ্বালিয়ে দাও বেদনার সব লাল পাহাড়,
উঁচু করে দাও সর্বহারাদের কঠিন মুষ্ঠি।
হুংকার ছেড়ে নিপীড়িতদের করো একজোট,
দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দাও বেঁচে থাকার আশ্বাস,
প্রতিবাদ করো, হে আকাশ প্রতিবাদ করো।

নবীন, প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬ থেকে নেওয়া

রক্তে ঝরা একুশে

মো. রাকিবুল বিশ্বাস
সদস্য ১১২৬/২০১৪

সালাম দিয়েছে মাকে কথা
আনবে ছিনিয়ে মাতৃভাষা।
১৪৪ ধারা ভেঙে দেয় বরকতেরা
ঘাতকের আঘাতে লুটায়ে পড়ে রফিক,
শফিকের বুক থেকে রক্ত ঝরে
এ তো রক্ত নয় অবিরত বর্ণমালা ঝরে।

সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক
আরও নাম না জানা কত শফিক,
দিয়েছে প্রাণ, ঝরিয়েছে রক্ত।
করেছে রঞ্জিত ঢাকার রাজপথ
এনেছে কেড়ে বাংলা ভাষা
২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুর বেলা।
মায়ের চোখে অশ্রু ঝরে
কোথায় আমার রফিক? কোথায় আমার শফিক?
'মা' মা বলে কে ডাকবে এই বাংলায়?

তবুও মায়ের মুখে অতি উজ্জ্বল হাসি।
তাদের বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোটায়
অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে এই বাংলায়।
পাখির মুখে ফুটল কথার ঝুরি
বাংলায় গান গেয়ে নীড়ে ফিরে যায়।
রক্তে ঝরা একুশে
ভালোবাসার একুশে,
এই বিশ্ব দিয়েছে তোমায় স্বীকৃতি,
রাখব তোমায় অমর করে।

উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা চ্যালেঞ্জ অর্থনীতির ভিত মজবুত করা

এই স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘের বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) উন্নয়ন নীতিবিষয়ক কমিটি (সিডিপি) শুক্রবার বাংলাদেশের এ যোগ্যতা নিশ্চিত করেছে।

জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ বিষয়ে এক ঘোষণায় বাংলাদেশের এ যোগ্যতা অর্জনের তথ্য দেয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশ হবে বাংলাদেশ।

তবে নতুন এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ বয়ে আনবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। কেননা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাণিজ্য ও বৈদেশিক ঋণে যেসব বাড়তি সুযোগ রয়েছে, সেগুলোর সবকিছু থাকবে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন হলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মানুষের জীবনমানের ক্রমাগত উন্নতি করা সম্ভব।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন জানান, ২০২১ সালে দ্বিতীয় পর্যালোচনা করবে সিডিপি। ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এ উত্তরণকে অনুমোদন দেবে। বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন যেভাবে আছে, তার কোনো বড় ধরনের ব্যত্যয় না ঘটলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছাবে।

'তিনটি সূচকেই যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ, যা এর আগে অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে ঘটেনি'

উন্নয়নশীল দেশ হলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কি হবে, জানতে চাইলে জাহিদ হোসেন বলেন, 'উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি একটা মর্যাদার বিষয়। বাংলাদেশকে সবাই তখন আলাদাভাবে বিচার করবে। এর আগে বহু দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা–এ তিনটি সূচকেই যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ, যা এর আগে অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তবে উন্নয়নশীল দেশ হলে বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে বাণিজ্যে যে অগ্রাধিকার পায় তার সবটুকু পাবে না আবার বৈদেশিক অনুদান, কম সুদের ঋণও কমে আসবে।'

তিনি বলেন, 'এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে বিভিন্ন দেশে জিএসপি বা শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি সুবিধা পায়। এর সঙ্গে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) আওতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনেক দেশ আমাদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। আবার এলডিসি হিসেবে ওষুধ রফতানির ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত

আন্তর্জাতিক বিধিবিধান থেকে আমাদের অব্যাহতি রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশকে কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। এলডিসি না থাকলে তখন সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে কি সেটা একটা প্রশ্ন। যেমন–ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন যে জিএসপি দেয়, তা ২০২৭ সাল পর্যন্ত থাকবে। এরপর জিএসপি প্লাস পাওয়ার কথা রয়েছে।'

ড. জাহিদ হোসেন জানান, বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। মাথাপিছু আয়ের বিবেচনায় এ শ্রেণিকরণ করে বিশ্বব্যাংক। জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত (এলডিসি), উন্নয়নশীল এবং উন্নত–এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সাল থেকে এলডিসি পর্যায়ে রয়েছে।

'যেসব ইনস্টিটিউশন এখনো দুর্বল, সেগুলোকে আরো উন্নত করতে হবে'

জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটি (সিডিপি) গত ১২ থেকে ১৬ মার্চ এলডিসি দেশগুলোর ওপর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠকে বসে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা–এ তিনটি সূচকের দুটিতে উত্তীর্ণ হলে কোনো দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে শুধু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেও কোনো দেশ যোগ্য হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের যে মানদণ্ড রয়েছে ওই দেশের মাথাপিছু আয় তার দ্বিগুণ হতে হবে।

২০১৮ সালের পর্যালোচনায় এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা হিসেবে মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ড হতে হয় ১২৩০ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংক প্রণীত অ্যাটলাস পদ্ধতির হিসাবে গত তিন বছরের গড় মাথাপিছু আয় ওই পরিমাণ হতে হবে। ওই পদ্ধতিতে গত তিন বছরে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১২৭৪ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে মাথাপিছু আয় আরও বেশি, তাদের হিসাবে গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৬০৫ ডলার।

পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'উত্তরণের সব পর্যায়েই কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। এগুলো মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটার তিন বছর পর থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বর্তমান জিএসপি সুবিধা থাকবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলো ইইউতে জিএসপি প্লাস সুবিধা পায়। বাংলাদেশকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এলডিসি না থাকলে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশেও অনেক ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। এজন্য বিমসটেক, বিবিআইএনের মতো আঞ্চলিক উদ্যোগের সুবিধা কীভাবে কার্যকরভাবে নেওয়া যায় তার প্রস্তুতি থাকতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিযোগিতা সমতা আরও বাড়াতে হবে। কেননা শুল্কমুক্ত সুবিধা না থাকলে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। পাশাপাশি আমাদের যেসব ইনস্টিটিউশন এখনো দুর্বল, সেগুলোকে আরো উন্নত করতে হবে। সেটা অর্থনৈতিক ইনস্টিটিউশনই হোক আর রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশনই হোক।'

বাংলাদেশ ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'এভরিথিং বাট আর্মস' উদ্যোগের আওতায় পণ্য রফতানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার, পরিবেশ ও সুশাসন বিষয়ে ইইউর নিয়ম-কানুনের শর্ত পূরণ করলে জিএসপি প্লাস নামে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা পাবে বলে জানান ড. আহসান এইচ মনসুর।

dw.com

সাজেক যেন মেঘ পাহাড়ের পথ

চেকপোস্টের কাছাকাছি হতেই নামতে হল। পরিচয় পেশা নাম ঠিকানা আগমনের কারণ জানতে চাওয়া হল। এসব বলে যখন রওনা হলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। তারপর তো বাহন মহেন্দ্র অটোরিকশা আমাকে আর বুশরাকে নিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলা শুরু করল তার দুরন্ত গতিতে।

এবার শুধু দেখার পালা। চলছি আর দেখছি, কত সুন্দর এই দেশ আমার। কত চড়াই উৎরাই আর সবুজ বাঁশবন দেখে দেখে এগিয়ে চলা। ওহহো, কোথায় যাচ্ছি তাই তো বলা হয়নি। আমরা দু-বোন মিলে সাজেক যাচ্ছি। বহুদিন ধরে সাজেক নামে গন্তব্যটি মনের মধ্যে লালিত ছিল। তাই গত বছরের শেষ মাসে শেষ দুদিন আগে আমি আর বুশরা শান্তি পরিবহনের বাসে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। পরদিন সকাল আটটায় দিঘিনালা পৌঁছি।

সেখানে নেমেই মনটা ভালো হয়ে গেল। ততক্ষণে মফিজ ভাই আমাদের জন্য মহেন্দ্র নিয়ে চলে এসেছেন। তার সঙ্গে কথা বলে অটোতে উঠে দিঘিনালার এক আদিবাসি হোটেলে নাশতা সেরে যাত্রা শুরু করতে করতে দশটা বেজে যায়।

সেদিন শনিবার হাটবার থাকায় যাত্রা। আগে হাটটাও ঘুরে দেখে নেই। তারপরই চেকপোস্ট পার হয়ে বাঘাইহাটের পথ ধরে ছুটে চলা। এক সময় মাইনি নদী পার হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নেই মাসালং ও কাসালং নদী দুটো।

মাইনি নদী দেখে আফসোস হয়, মাসালং নদীতে অল্প জল। এভাবেই পথ থেকে পথে এগিয়ে ঠিক সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আমাদের বাহন সাজেকের রুইলুই পাড়া পৌঁছে।

শেষ পর্যন্ত সাজেক চলেই এলাম বলে বুশরা মহেন্দ্র থেকে নেমে পা রাখে রুইলুই পাড়ার মাটিতে। তবে আমরা রুইলুই পাড়ায় থাকব না আগেই ঠিক হয়ে ছিল। এখানে রাস্তার ধারের এক রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেয়ে আবার মহেন্দ্রতে চাপি। সেখান থেকে কংলাকপাড়া অল্প সময়ের গন্তব্য।

কোনো এক লেখায় পড়েছিলাম রুইলুই পাড়াই সাজেকের প্রাণ। সেই প্রাণকেন্দ্র ধরে আমরা সাজেক উপত্যকার দ্বিতীয় হেলিপ্যাডের কাছে চলে আসি। তারপর তৃতীয় হেলিপ্যাড আরও পেছনে ফেলে কংলাক পাড়ায়।

এখানে এক পাংখো পরিবারের সঙ্গে আমাদের সাজেক বসবাসের ব্যবস্থা হয়। কারবারি থান লেয়াং পাংখোয়া ও তার অসাধারণ পরিবারের গল্প আজীবন মনে থাকবে।

চারপাশে পর্যটক কোলাহল নেই। ছিমছাম নিরিবিলি পরিবেশ। মফিজ ভাই আমাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থাই করেছিলেন। শুধু

ভালো বলা যাবে না, বলতে হবে অতি-অসাধারণ।

বিশাল ঘর, যে ঘরে আবার তিনটি বিছানা। আমরা রুম থেকে বের হয়ে রাতে কি খাব বলে রাখি, তারপর ফ্রেশ হয়ে সামনের পাহাড় দেখি, আকাশ দেখি।

কংলাক পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতায় একবার ঘুরে এসে আমাদের রুমের পাশের ছোট্ট টিলা মতো জায়গা ঘেরা বাঁশঝাড়ে বসে গল্প করি। এভাবেই রাত নামে, সে রাতে আকাশে ছিল আধ ফালি চাঁদ। চাঁদের আলোয় কখন আমরা কম্বলের তলে আশ্রয় নিলাম, সে মনে নেই। তবে, ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়েছিলাম বেশ মনে আছে।

আমরা বের হয়েই আবার আকাশ দেখি, দেখি সামনের পাহাড়। ভোরের আকাশে উপভোগ্য হয়ে ওঠে মেঘেদের অপার শোভায়। চারিদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। মেঘেদের সরিয়ে মাত্রই সূর্যমামা জেগে উঠছে। রুইলুই পাড়ার পর্যটকদের দেখা গেল কংলাক পাহাড়ের উচ্চতায় দলবেঁধে উঠছে, আমরাও সে কাফেলায় সামিল হলাম।

কংলাক পাড়ার চার্চ পেরিয়ে সাজেক উপত্যকার সর্বোচ্চ উচ্চতায় বা কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ি। সে এক অসাধারণ দৃশ্য আর অসাধারণের কোনো ভাষা নেই। মেঘের জন্য পাহাড়গুলো আর পাহাড় ছিল না, মেঘ পাহাড়ের পথ যেন! এক অন্য পৃথিবী, সে সৌন্দর্য বর্ণনা আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে পুরো সাজেক এলাকার অনেক দূর অবধি তাকাই। মনে হয় এ শুধু চেয়ে দেখার দিন। অপার মুগ্ধতা নিয়ে আমরা দুবোন মেঘে ঢাকা সাজেককে চেয়ে শুধু দেখলাম, দেখতেই থাকলাম আর অবাক হলাম!

প্রয়োজনীয় তথ্য

সাজেক ভ্যালিতে আমাদের খাগড়াছড়ি হয়ে যেতে হলেও আসলে সাজেক পড়েছে রাঙামাটি জেলায়। তবে জেলা যাই হোক, সাজেক আপনাকে যেতে হবে খাগড়াছড়ি আর দিঘিনালা হয়ে।

খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যাওয়ার পথটি অসাধারণ। পুরো পথই পাহাড় আর ঘনবনে ঘেরা। চলতি পথে মাঝে মাঝে ঝিরির মতো ছোটো ছোটো নদী ও কালভার্টের দেখা মিলবে। আর দেখা পাবেন বিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ি গ্রাম।

মেঘে মোড়া রঙিন ক্যানভাসের সাজেক সৌন্দর্যের সঙ্গে এই পথ সৌন্দর্যটুকু বাড়তি পাওনা। আর একটা পাওনা হল মাসালং ও কাসালং নদীর সৌন্দর্য উপভোগ। অবশ্য শুরুতেই আপনার সঙ্গে মাইনি নদীর দেখা হয়ে যাবে। আর শীতের তীব্রতায় ঝরনার পানি উধাও হলেও এক ঝলক হাজাছড়া ঝরনা দেখে আসতে পারবেন।

ঢাকা থেকে খাড়গড়াছড়ি যাওয়ার সরাসরি সব ধরনের বাস সার্ভিস রয়েছে। এসিবাস সেন্টমার্টিন বা শান্তি পরিবহণের রয়েছে। নন এসি বাস শান্তি পরিবহন সহ শ্যামলী, ঈগল, হানিফ, এস আলম।

দিঘিনালা থেকে চান্দের-গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যবস্থা আগে থেকে করে গেলেই ভালো। না করলে একটা সুবিধা হচ্ছে দরদাম করে একটা গাড়িতে চড়ে বসা যায়। লোক সংখ্যা তিন বা চার হলে একটা মহেন্দ্র অটো রিকশা নিয়ে নেবেন। আর যাত্রার সময় সকালের নাশতা দিঘিনালাতে কোনো এক পাহাড়ি রেস্তোরাঁয় সেরে নিতে পারবেন।

আরেকটা কথা, সাজেক থাকার ব্যবস্থা এখন অনেক। বিজিবি পরিচালিত রুনময় রিসোর্ট, সেনাবাহিনি পরিচালিত সাজেক রিসোর্ট আর প্রাইভেট রিসোর্ট আলো রিসোর্টসহ এখন কত যে রিসোর্ট আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। রিসোর্ট আর মানুষ মিলে সাজেক এখন মেলায় পরিণত।

তাই নিরিবিলির খোঁজে কংলাক পাড়া চলে যান। এক-দু রাত বাস করে আসুন পাংখো বা লুসাইদের ঘরে, খুব ভালো লাগবে বলতে পারি। আমরা দুদিন ছিলাম, রুইলুই পাড়ায় বিকেলে কেবল বেড়াতে যেতাম। তবে যেখানেই থাকেন সে ব্যবস্থা ঢাকা থেকেই করে যাবেন।

হাদিরাতুল তালুকদার
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

গুগল ম্যাপের ৫টি চমৎকার ব্যবহার!

গুগল মানেই যেন ম্যাজিক! তথ্যপ্রযুক্তির জগতে জাদুময় মুগ্ধতা ছড়িয়ে চলা গুগলের অনন্য একটি ফিচার গুগল ম্যাপ। মাত্র ক'বছর আগেও অচেনা কোথাও যেতে হলে দশজনকে জিজ্ঞেস করে পথঘাট চিনে তারপর রওনা দিতে হতো।

কিন্তু গুগল ম্যাপের কল্যাণে পৃথিবীর কোনো প্রান্ত এখন আর অচেনা নেই! যেখানেই যেতে চাও না কেন, ম্যাপে সার্চ করলেই সাথে সাথে বের করে দেবে পথ, কীভাবে যেতে হবে সবকিছু! বিশ্বজুড়ে গুগল ম্যাপ অসম্ভব জনপ্রিয় হলেও আমাদের দেশে এখনও অনেকেই এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই চলো আজ জেনে নেওয়া যাক গুগল ম্যাপের ৫টি চমৎকার টিপস এবং ট্রিকস, যেন এখন থেকে ম্যাপ ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারো সহজেই।

ম্যাপেই জেনে নাও যানজটের হালচাল!

কেমন হয় যদি ম্যাপ দেখেই জেনে নেওয়া যায় কোন রাস্তায় জ্যাম আছে আর কোন রাস্তা ফাঁকা? তাহলে নিশ্চয়ই অনেক সময় বেঁচে যেত, তাই না? সে সুযোগ করে দিতেই গুগল ম্যাপ নিয়ে এসেছে লাইভ ট্রাফিক আপডেট–এটি উন্নত বিশ্বে সেই ২০০৭ সাল থেকে চালু থাকলেও বাংলাদেশে চালু হয়েছে সম্প্রতি।

এটি ব্যবহার করতে ম্যাপের মেনু থেকে 'রিয়্যাল টাইম ট্রাফিক'-এ ক্লিক করে 'ট্রাফিক' অপশনে গিয়ে 'লাইভ ট্রাফিক' থেকে 'টিপিক্যাল ট্রাফিক' করে নাও।

ট্রাফিক অপশনটি চালু হলে ম্যাপে রাস্তার ওপরে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল রং দেখতে পাবে। সবুজ রং দেখা গেলে বুঝতে পারবে সে রাস্তায় এখন জ্যাম নেই। কমলা রং দেখা গেলে মাঝারি জ্যাম আর লাল রং থাকলে বুঝে নিতে হবে কঠিন যানজট, সে রাস্তা দিয়ে না যাওয়াই শ্রেয়!

প্রশ্ন হচ্ছে কোন রাস্তায় জ্যাম আর কোন রাস্তা ফাঁকা–গুগল কীভাবে সেটি বের করে? গুগল সে খবর বের করতে 'ক্রাউড সোর্সড ডাটা' ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ রাস্তায় যত মানুষ যানবাহনে চলাচল করছে তাদের স্মার্টফোনে যদি লোকেশন সার্ভিস অন করা থাকে তাহলে গুগল সেগুলো থেকে ট্রাফিকের ডাটা সংগ্রহ করে ইন্ডিকেটর তৈরি করে। এর মাধ্যমে গুগল রাস্তায় থাকা গাড়ির সংখ্যা, কত দ্রুত গাড়িগুলো চলছে সেগুলো হিসেব করে জানিয়ে দেয় জ্যামের খবারখবর।

কম খরচে ম্যাপ ব্যবহার : Lite Mode

আমরা অনেকেই মোবাইল ডেটার সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করি, তাই গুগল ম্যাপ কিছুটা ব্যয়বহুল মনে হতে পারে। এজন্যই গুগলের চমৎকার একটি ফিচার হচ্ছে 'গুগল লাইট' যেখানে ইন্টারনেট খরচ অনেক কম। এই লিঙ্কে ক্লিক করে যেতে পারো গুগল লাইট ম্যাপে, অথবা 'Google map lite' লিখে গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবে।

https://www.google.com/maps/@24.8613815,89.3748456,15z?force=lite

এখানে স্ক্রিনের ডান পাশে নিচের একটি লাইটনিং বাটন নিশ্চিত করবে

যে তুমি লাইট মোডে আছো। ফেসবুকের যেমন রয়েছে ফেসবুক লাইট, কিংবা অপেরা মিনি, ইউসি মিনি, সেরকম, গুগল ম্যাপেরও সহজ মাধ্যম হচ্ছে গুগল ম্যাপ লাইট। সুতরাং তুমি ওয়াইফাই অথবা মোবাইল ডেটা যেটাই ব্যবহার করো না কেন, ম্যাপ চালাতে আদৌ তেমন খরচ হবে না, কিন্তু আসল ম্যাপের সবগুলো সুবিধাই মোটামুটি উপভোগ করতে পারবে!

ইন্টারনেট ছাড়াই যেভাবে চালাবে গুগল ম্যাপ

মনে করো তুমি একটি জায়গায় বেড়াতে গেলে, কিন্তু সেখানে ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেললে! একবার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছিল। গুগল ম্যাপ দেখে যে পথ খুঁজে নেবো সে রাস্তাও খোলা নেই; সবার সাথেই স্মার্টফোন আছে, কিন্তু কারো ফোনে নেটওয়ার্ক আসছে না!

কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি আগে থেকেই সেই এলাকার ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখতে পারো

বিরান পাহাড়ে আমরা একদম একা, এদিকে সূর্য ডুবে গেছে, চারপাশে শেয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক। আমাদের একটু ভয় ভয় করছে, তখন এক বন্ধু নির্বিকার মুখে ফোন বের করে ম্যাপ খুলে গড়গড় করে বলে গেল কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। আমরা তো অবাক! পরে জানা গেল সে আগেই এই এলাকার গুগল ম্যাপ ডাউনলোড করে রেখেছিল!

এখানেই গুগল ম্যাপের তেলেসমাতি, একবার একটি এলাকার ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখলে কোনরকম ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই জেনে নেওয়া যাবে সেই এলাকার রাস্তাঘাট সবকিছু। পরেরবার কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি আগে থেকেই সেই এলাকার ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখতে পারো, যেখানেই যাও–পাহাড়-পর্বত, গহীন জঙ্গল কোথাও হারিয়ে যাবার ভয় আর থাকবে না!

যেকোন জায়গার দূরত্ব মাপার সুযোগ

গুলিস্তান থেকে গুলশানের দূরত্ব কত? কিংবা তোমার বাসা থেকে গ্রামের বাড়ির?! ভাবতে কঠিন শোনালেও তুমি চাইলে নিমেষেই বের করে ফেলতে পারো যেকোন দূরত্ব গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে।

এজন্য তোমাকে প্রথমে যেখান থেকে দূরত্ব মাপতে চাও সেই লোকেশনে ড্রপ পিন দিয়ে হোল্ড করতে হবে। তারপর ড্রপ পিন এ চাপ দিলে কতগুলো অপশন আসবে, সেখান থেকে 'Measure Distance' এ ক্লিক করলেই তুমি দূরত্ব মাপতে পারবে।

কোথায় আছ প্রতিমুহূর্তে জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ

কিছুদিন আগে এক স্কুলছাত্র একাকী গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অপহরণের শিকার হয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে বেচারা অপহরণকারীরা তাদের আস্তানায় পৌছাতে না পৌছাতেই দেখে তাদের জন্য পুলিশ অপেক্ষা করে আছে!

আমরা প্রায়ই টেনশনে পড়ে যাই আমাদের ক্যারিয়ার নিয়ে, ভবিষ্যত নিয়ে। এই টেনশন থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ঝটপট ঘুরে এসো ১০ মিনিট স্কুলের এই এক্সক্লুসিভ প্লে-লিস্ট থেকে!

ব্যাপারটা কীভাবে ঘটলো সেটা বুঝে উঠার আগেই সবার হাতে হাতকড়া পড়ল, আর ঘরের ছেলে নিশ্চিন্তে ফিরে এলো ঘরে। পরে জানা গেল ছেলেটি সবসময় গুগল ম্যাপের মাধ্যমে সে কোথায় আছে সেটি জানিয়ে রাখত তার বাবাকে, তাই যখনই বাবা দেখলেন ছেলের লোকেশন যেখানে যাওয়ার কথা সেখান থেকে অনেক দূরে, তখনই তার মনে সন্দেহ জাগে, পুলিশকে ফোন করেন।

এজন্য ছেলেটি ব্যবহার করেছিল গুগল ম্যাপের 'Share your location in real time' নামের একটি ফিচার। এটি ব্যবহার করে তুমিও যাকে খুশি জানাতে পারবে তুমি এখন কোথায় আছো। সেজন্য মেনু থেকে Share Location এ ক্লিক করে ডিউরেশন সিলেক্ট করে গুগল কনট্যাক্ট থেকে যাকে যাকে জানাতে চাও সিলেক্ট করলেই তাদের সাথে লোকেশন শেয়ারিং শুরু করতে পারবে।

10minuteschool.com

৩ ডিসেম্বর ২০১৭

দুর্ভিক্ষ ও জয়নুল

জয়নুল ১৯৪৩ সালের এই দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বেঁচে থাকার আর্তিকে মোটা তুলিতে যেভাবে রূপায়িত করেছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। এই চিত্রমালা একদিকে মানবিক বিপর্যয়ের আশ্চর্য দলিল হয়ে আছে, অন্যদিকে এই চিত্রমালা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা শিল্পী।

(গত সংখ্যার পর)

দুর্ভিক্ষবিষয়ক চিত্রমালা নিয়ে রচিত গ্রন্থ *কালচেতনার শিল্পী* বইয়ের ভূমিকায় কলা-সমালোচক অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বাংলার সাহিত্য শিল্পের যে ধারা বয়ে আসছিল, তার মধ্যেও দেখা দিলো নতুন প্রবণতা। লেখক-শিল্পীদের এক বড়ো অংশ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতায় কলাকৈবল্যের পথ ছেড়ে বাস্তবধর্মিতার পথে এগোলেন, এমনকি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসেবে ঘোষণা করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের শরিক হলেন। বাংলার কবিতা-কথাসাহিত্যে, নাটকে-গানে যুগান্তর ঘটল। চিত্রকলাও পিছিয়ে থাকল না। দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দিনগুলোতে মতাদর্শ-নির্বিশেষে অনেক অগ্রগণ্য শিল্পীই বুভুক্ষু মানুষের ছবি আঁকলেন; যেমন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুল বসু, গোবর্দ্ধন আশ, সুধীর খাস্তগীর, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, সূর্য রায়, ইন্দ্র দুগার ও রামকিঙ্কর। এঁরা দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন মূলত সময়ের মানবিক প্রেরণায়। তুলনায় আমাদের আজকের নির্বাচিত চারজন শিল্পীর সমগ্র জীবনধারা ও শিল্পসাধনাই গড়ে উঠেছে সেদিনের সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এঁরা সেদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের সঙ্গেই একাত্ম থেকেছেন, তাঁদের দুঃখ-বেদনা, আশা-আনন্দ, বাঁচবার আন্দোলন সবকিছুকেই করে নিয়েছেন শিল্পের প্রধান বিষয়। এঁরা, বলাবাহুল্য, এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী, যে-ধারা পৃথিবীর দেশে দেশে কলাশিল্পের মূলধারার সঙ্গে কখনো মিলিত হয়ে, কখনো সমান্তরালে বয়ে চলেছে। বাংলায় সেই ধারার সূত্রপাত উনবিংশ শতকের শেষার্ধে–যখন সরকারি আর্ট স্কুলে বাস্তববাদী ছবি আঁকার শিক্ষা নিয়ে বাঙালি তরুণেরা বেরোতে শুরু করেছেন।'

জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে কলকাতার বাম ধারার চিত্রশিল্পীদের সখ্য গড়ে উঠলেও তিনি রোমান্টিক ধারায় ছবি এঁকে চলেছিলেন।

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। বাংলার গ্রামের নিম্ন আয়ের ও নিম্নবিত্তের মানুষ যৎসামান্য খাদ্য সংগ্রহের আশায় কলকাতায় ছুটে আসতে থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এবং একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্য মজুদ করায় খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করে। সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতিকে এ-দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তীকালে অনেকে বলেছেন, জয়নুল কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহে চলে আসেন। দুর্ভিক্ষের এই রূপ দেখে তিনি বিচলিতবোধ করেন। দুর্ভিক্ষজনিত কারণে কলকাতার রূপ বদলে যেতে থাকে। শতসহস্র মানুষ ভিক্ষা করতে শুরু করেন। চাল ও সামান্য খাদ্যের জন্য আহাজারি করেন। এক মুঠি চাল দিতে না পারলে শুধু ভাতের ফ্যানের জন্যও কাকুতি-মিনতি করেন। খাদ্যের অভাবে শীর্ণ-দীর্ণ

শত-সহস্র মানুষ কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে এ-সময় মারা যান। শহরের নানা জায়গায় মৃত মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডাস্টবিনের সামনে শীর্ণকায় এই মানুষেরা কুকুরের সঙ্গে, কখনো কাকের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাবার খুঁজতে থাকে।

এই দুর্ভিক্ষ কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়কেও প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। ১৯৪৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ৩৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক একটি বিবৃতি দিলেন সংবাদপত্রে এবং দেশের মানুষকে সহায়তা করার জন্য আকুল আবেদন জানান। এই বিবৃতিটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

১৯৯৩ সালের নভেম্বরে প্রতিক্ষণ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল 'অখণ্ড বাংলায় শিল্পীর তুলিতে স্মৃতিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর' শীর্ষক সমীর ঘোষের একটি লেখা। এই লেখাটিতে আচার্য জয়নুল আবেদিন প্রসঙ্গে যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি সেই সময়ের প্রাসঙ্গিক চেতনা খুবই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

শতবার্ষিকীর আলোছায়ায় কিছু কথা

জয়নুল আবেদিনের বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের সৃষ্টিতে লোকশিল্পের আত্তীকরণ ও আধুনিক বোধের যে-প্রকাশ আমরা পর্যবেক্ষণ করি তা শুধু মনোজ সুষমামন্ডিত নয়, এদেশের চিত্রকলায় নব্যধারাও বটে। পরবর্তীকালে এ-ধারারই বলিষ্ঠ রূপকার হয়ে ওঠেন কাইয়ুম চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, রফিকুন নবীসহ অনেকে। ষাটের দশকের কয়েকজন শিল্পীর মধ্যেও এ-ধারার প্রকাশ ঘটে। এ-ধারার আধুনিকায়নের যে-অভিব্যক্তি, আমরা মনে করি বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের বিশিষ্টতা, চারিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের শনাক্তকরণে এ শক্তিশালী প্রকাশও বটে।

জয়নুল আবেদিনের আরেক বৃহৎ কীর্তি চিত্রবিদ্যার শিক্ষালয়টিকে সত্যিকার অর্থেই একটি আধুনিক শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে তোলা। প্রথম আবর্তনের মেধাবী কয়েকজন যখন উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি জমান আবেদিনের তাতে উৎসাহ ছিল। দুয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, পরিগ্রহণ ও ঐতিহ্যে আস্থার জন্য তিনি শিক্ষক হিসেবে যে আদর্শিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য শিক্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল। জয়নুলের শিল্পাদর্শকে করোটিতে ধারণ করেই তাঁদের মানসযাত্রা ও সৃষ্টি বলীয়ান হয়েছে। একটি বিষয়ে আমি তর্ক তুলতে চাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবর্তনের ছাত্ররা যে-ভিত রচনা করেছেন এদেশের চিত্রশিল্পে বিশেষত আধুনিকতায় ঐতিহ্য ভাবনায় ও শিকড় সন্ধানে, পরবর্তীকালে তা গতানুগতিক একটি বৃত্তে আবদ্ধ হয়েছে। ভাঙা ও গড়ার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পকে আরো বেগবান করার ও নবীন কোনো পথ নির্মাণের তাগিদ আমরা প্রত্যক্ষ করলেও তা খুব তীব্র নয়। পঞ্চাশের দশকের যে একঝাঁক শিল্পীকে দেখেছি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এদেশের চিত্রশিল্পে নতুন নতুন মাত্রা সঞ্চার করতে বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে, তা এখন আর দেখা যায় না। সে কি কেবল এজন্য যে, জয়নুলের মতো শিক্ষক ও অনুপ্রেরণাসঞ্চারী শিল্পী শিক্ষাঙ্গনে হয়ে পড়েছে বিরল।

এছাড়া সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে দুটি বিষয় আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। জলরঙে জয়নুল নিসর্গ অঙ্কনে যে-পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন চল্লিশের দশকে, তারই পরিশীলিত রূপ দেখতে পাই পরবর্তীকালে। এ যেন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে নানা পরিপ্রেক্ষিতে। লোকশিল্পের আদল থেকে তিনি পরিগ্রহণ করেছেন, ভাংচুর দেখি সৃষ্টিকর্মে, কখনো বিষয়ে। অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবীকে তিনি কোনোভাবেই ছেড়ে যাননি। বাল্য ও কৈশোরে যে নদী, নিসর্গ ও মানুষজনকে অবলোকন করেছিলেন, তা হয়ে উঠেছিল তাঁর উপজীব্য। নিম্নবর্গীয়রা শ্রদ্ধেয়ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। প্রতিবাদ নেই বটে, তবে এই রূপায়ণে বিশ্বস্তভাবে নিম্নবর্গীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলার লোকশিল্পের ও ঐতিহ্যিক প্রবাহের প্রতি তাঁর অনুরাগের যে-বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তা তাঁর শিক্ষার্থী ও দেশের সংস্কৃতজনের মধ্যে নবীন আলোকে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। বর্তমানে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে লোকশিল্প নিয়ে যে আনুকূল্যের প্রবাহ ও উৎসাহ এ জয়নুলেরই অবদান। জয়নুল এখানেও অনন্য।

জয়নুল আবেদিনের সৃজন ও সৃষ্টির স্বল্পতা নিয়ে নানা অভিযোগ শোনা যায়। প্রতিভার বহুকৌণিক স্ফুরণ সত্ত্বেও তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অফুরান হতে পারেননি। সাংগঠনিক কাজে তাঁর প্রতিভা ও কর্মপ্রবাহ অপচয়িত হয়েছে এমত কথাও শোনা যায়। এ-অভিযোগ ভিত্তিহীন, তাঁর সৃষ্টি গুণগত মানে অসামান্য, আধুনিকতার উজ্জ্বল প্রকাশে অন্যতম প্রধান শিল্পীপুরুষও বটে।

শতবার্ষিকীর আলোছায়ায় আচার্য জয়নুল আবেদিনকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যক্তিত্ব, লোকশিল্প ও ঐতিহ্যভাবনা এবং দেশ আত্মার মর্মবেদনা ও সংকট উত্তরণের জন্য তাঁর ভাবনা নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

জয়নুল আবেদিনের সৃষ্টির নানা ধারার মূল্যায়ন ও তাঁর সৃষ্টির প্রবাহকে বলীয়ান করলে আমাদের চিত্রকলা-আন্দোলন আরো অধিক খরপ্রবাহিনী এবং আধুনিকতার বহিঃপ্রকাশে উজ্জ্বল হবে সন্দেহ নেই। শতবার্ষিকীতে আমরা এই কামনা করি।

আবুল হাসনাত
কালি ও কলম

চলে গেলেন 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'

একুশ শতকের বিশ্বে তিনি সত্যিই ছিলেন এক বিস্ময়। কাজে, যাপনে, ভাবনায় এবং বেঁচে থাকায়। ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু হলো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের। কেমব্রিজে নিজের বাড়িতেই জীবনাবসান হয় তাঁর। তাঁর সন্তানেরা একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে স্টিফেনের। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু বিশিষ্ট মানুষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। টুইট করেন স্বনামধন্য মহাকাশ গবেষকেরা।

১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি অক্সফোর্ডে জন্ম হয় এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর। ছোটোবেলা থেকেই মহাকাশের প্রতি তাঁর অমোঘ টান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শুরু করেন হকিং। বিষয় ছিল পদার্থ বিজ্ঞান। কিন্তু তাঁর সে সময়ের শিক্ষক বার্মেন জানিয়েছেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হকিং পড়াশোনার ইচ্ছে হারান। কারণ, হকিংয়ের মনে হচ্ছিল, যা তিনি পড়ছেন তা খুবই সহজ। বিশেষ মনোগ্রাহীও নয়। তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষে গিয়ে বিষয়ের প্রতি খানিকটা উৎসাহ ফিরে পান তিনি। তবে ক্লাসে সবচেয়ে মিশুক ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হকিং। গান বাজনা, খেলাধুলো সবেই তাঁর উৎসাহ ছিল।

কালের বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কে ছিলেন তিনি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডে হকিংয়ের জন্ম। বাবা ফ্র্যাংক ও মা ইসোবেল হকিং দুজনেই ছিলেন গবেষক। উত্তর লন্ডনে ছিল তাঁদের নিবাস। কিন্তু তখন লন্ডনে বোমাবর্ষণ হবার কারণে স্টিফেনকে নিরাপদে জন্ম দেবার জন্য অক্সফোর্ডে চলে যান ফ্র্যাংক ও ইসোবেল। সেখানেই ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি জন্ম নেন কালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হকিং।

জেনারেল রিলেটিভিটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন হকিং। এবং ঠিক সেই সময়েই মাত্র ২১ বছর বয়সে ধরা পড়ে ভয়াবহ অসুখ মোটর নিউরোন। স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন হকিং। দীর্ঘদিন অবসাদের শিকারও ছিলেন। পৃথিবীতে খুব কম মানুষেরই এই রোগ হয়। যাঁদের হয়, তাঁদের মাত্র ১০ শতাংশ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন। হকিং সেই বিরল ব্যক্তিত্ব ভয়ানক রোগটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কেবল বেঁচেই ছিলেন না, গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন। এই সময়ের মহাকাশ বিজ্ঞানের সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। ব্ল্যাকহোল নিয়ে নিজের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিজেই সেই তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' স্টিফেন হকিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। সেখানে সাধারণভাবে দু'রকমের সময় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ব্যবহারিক সময় এবং মহাজাগতিক সময়। রিলেটিভিটি নিয়ে সম সময়ে এত বড় গবেষণা আর কেউ করেননি। শুধু তাই নয়, স্টিফেন বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান কেবল মুষ্টিমেয় গবেষকের আলোচনার বিষয় নয়। সকলের কাছে বিজ্ঞানের আলোচনা পৌঁছে দেওয়া দরকার। এবং সে কারণেই সহজ ভাষায় মহাকাশ, সময় এবং ব্ল্যাকহোল নিয়ে তিনি বই লিখেছেন। যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন আলোচনাসভায়। সহজ করে বুঝিয়েছেন বিজ্ঞান।

বছরকয়েক আগে হকিং আচমকাই ঘোষণা করেন, সময় এবং ব্ল্যাকহোল নিয়ে তাঁর আগের গবেষণায় অনেক ভুল আছে। ভুল সংশোধনের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। নিজেকেই নিজে ভুল প্রমাণ করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন হকিং। কারণ, অ্যাকাডেমিক বিশ্বে খুব কম মানুষই এমন কাজ করতে পেরেছেন।

বহু বিস্ময়ের অবসান ঘটিয়েছেন হকিং। বহু বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি, বিস্মিত করেছেন ঈশ্বর নিয়ে তাঁর ভাবনায় হয়তো মৃত্যু হলো বিজ্ঞানীর। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, তাঁর বিস্ময় নিয়ে আগামী বহু বছর কাজ করতে হবে বিশ্বকে। চিরস্মরণীয় হয়ে সকলের মধ্যে বেঁচে থাকবেন স্টিফেন হকিং।

সূত্র : dw.com

সময় এখন নারীর চার খাতে জয়জয়কার

বাংলাদেশি নারীদের উন্নয়নের যাত্রা বিশ্বে এখন রোলমডেল হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে শহরের নারীদের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরাও দেশ ও পরিবারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) প্রতিবেদন, ২০১৭ মতে, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের বড় অগ্রগতি হয়েছে। এর আগের বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭২তম আর এক বছরের ব্যবধানে এ সূচকে বাংলাদেশ ২৫ ধাপ এগিয়ে ৪৭তম হয়েছে, যা নারী উন্নয়নে ইতিবাচক বিষয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরে। মূলত চারটি খাতে ইতিবাচক অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশের নারীর এই অর্জন। খাতগুলো হচ্ছে–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারীর উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি বর্তমানে বেসরকারি বিভিন্ন এনজিও সংস্থাও শিক্ষা, কৃষি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে নারীকে সহায়তা করছে, যা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষা : বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়সী মেয়েশিশু ও নারীর শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রেণিকক্ষে আগের চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিকে মেয়েশিশুর অংশগ্রহণ এখন ছেলে শিশুদের চেয়ে বেশি। মেয়েশিশুর প্রাথমিকে অংশগ্রহণের হার শতকরা ৫১ ভাগ। আর নারী ও মেয়েশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি ও বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাদের পাঠ্যপুস্তকও বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গত এক দশকে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহের হারও ৩৫ শতাংশ কমেছে।

স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশি নারীদের অগ্রগতি অতীতের চেয়ে বর্তমানে স্পষ্টভাবেই বেশি। মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক শিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ভালো অবস্থান তৈরি করেছে। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী দেশের কর্মজীবী নারীরা ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করতে পারবেন, যা অনেক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের নারীরাও উপভোগ করতে পারেন না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যু হার প্রতি ১০ হাজারে ১৭৬ জন। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ১০ হাজারে ৩৩৯ থেকে বর্তমানে ১৭৬-এ নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের হিসাবে, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ নারী নিজের এবং তার শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার সিদ্ধান্ত এখন নিজেরাই নিচ্ছেন। আর কর্মজীবী নারীরা গৃহিণীদের চেয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে (১.৭৩ শতাংশ বেশি) সচেতন।

কৃষি : কৃষি খাতেও আছে বাংলাদেশি নারীর তাক লাগানো সাফল্য। তথ্য মতে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে ৭০ শতাংশই কৃষিকাজে জড়িত। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার (বিআইডিএস) গবেষণা বলছে, গ্রামীণ ৪১ শতাংশ নারী আলু চাষের সঙ্গে এবং ৪৮ শতাংশ নারী মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া গ্রামীণ নারীরা বীজ বপন থেকে শুরু করে জমিতে সার দেওয়া, আগাছা দমন, কীটনাশক ছিটানো, ধান কাটা, ধান থেকে চাল পাওয়ার প্রক্রিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৃষিকাজে জড়িত। বিশেষ করে মাছ চাষের মাধ্যমে নারীরা শুধু দেশের অর্থনীতিতেই অবদান রাখছে না, নিজের পরিবারের পুষ্টিচাহিদাও মেটাচ্ছে। এরই মধ্যে মাছ চাষ করে অনেক নারী তার পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। ওয়ার্ল্ড ফিশ নামক সংস্থার মতে, বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ গ্রামীণ নারী মাছ চাষ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত।

রাজনীতি : বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক অনুযায়ী, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান সপ্তম। জাতীয় সংসদে নারীদের আছে ৫০টি আসন। আর স্থানীয়ভাবে ১২ হাজার নারী রাজনৈতিক কর্মী এখন সক্রিয় আছেন। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে নারীরাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এমনকি বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেতা এবং জাতীয় সংসদের স্পিকারও নারী। বাংলাদেশে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তের বিষয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'নিবন্ধনের শর্ত রাজনৈতিক দলগুলো মানছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। রাজনৈতিক দলের কমিটিতে নারীর ৩৩ ভাগ উপস্থিতি থাকার বিষয়ে দলগুলোকে ইসি সতর্ক করতে পারে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কমিটিতে নারী নেতৃত্ব বেড়েছে। আশা করছি দলটি শর্ত পূরণ করবে। তবে বিএনপিতে নারীর অংশগ্রহণ কম। নারী নেতৃত্ব বিকশিত না হলে নারীর প্রতি সহিংসতা কমবে না।'

অর্থনীতি : বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, বর্তমানে নারী শ্রমিক ও কর্মজীবীদের ৩৪ শতাংশ দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। যদি আগামী এক দশকে এ সংখ্যা আরও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়, তবে জিডিপির প্রবৃদ্ধি আরও ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এরই মধ্যে দেশের ৩৫ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ ছাড়া ১২০টি উপজেলার আরও ৯ হাজার নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দেবে তারা। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সেলিমা আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দেশের নারীরা এখন অর্থনীতিতে অবদান রাখার ব্যাপারে সচেতন। সরকারের রাজস্ব কোষাগারে নারীর আয়ের টাকা জমা হচ্ছে। তারা এখন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় এগিয়ে আসছে। আগের চেয়ে তাদের ক্ষমতায়নের বিস্তৃতিও বাড়ছে। তবে নারীদের এগিয়ে যেতে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নারী যাতে ক্ষুদ্র থেকে বড় ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে সে জন্য ব্যাংক থেকে তাদের স্বল্প সুদে বড় অঙ্কের ঋণসুবিধা দিতে হবে।

জিন্নাতুন নূর

bd.pratidin.com ৮ মার্চ ২০১৮

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ও মানব উন্নয়ন

আলমগীর এম এ কবির
ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

সত্যিকার অর্থেই জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত থাকার জন্য দেশীয় যেসব সংস্থা পরিচিতি লাভ করেছে তাদের মধ্যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এইচডিএফ) অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এইচডিএফ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছে–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং মননশীলতার উন্নয়নসহ যেকোনো ধরনের মানবীয় উদ্যোগে সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু খাতকে যেমন–স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গবেষণা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, পুনর্বাসন এবং প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে এইচডিএফ উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। একদল ত্যাগী এবং নিবেদিতপ্রাণ সমাজহিতৈষী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন আজকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৮৩ সালে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বিসিসিআই (ব্যাংক অব কমার্স এন্ড ক্রেডিট ইন্টারন্যাশনাল)-এর বাংলাদেশস্থ শাখা এদেশ থেকে অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবার উদ্দেশ্যে 'বিসিসি ফাউন্ডেশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। দেশের কয়েকজন বরেণ্য সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় বিসিসি ফাউন্ডেশন ধীরে ধীরে তার সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড প্রসারিত করে। ওই সব কর্মকান্ডের অন্যতম ছিল 'মেধা লালন প্রকল্প'। কিন্তু ১৯৯১ সালে দুর্ভাগ্যজনভাবে এদেশে বিসিসিআই ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়; যার সরাসরি প্রভাব পড়ে বিসিসি ফাউন্ডেশন ও এর কর্মকান্ডের উপর। আইনগত জটিলতার কারনে গভীর অর্থ সংকটে পড়ে বিসিসি ফাউন্ডেশন। চরম অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মেধা লালন প্রকল্পে সম্পৃক্ত অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং একইসাথে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সুবিধাভোগী কিছু উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠিরও প্রাপ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

এমতাবস্থায়, ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব আলমগীর এম এ কবির, মরহুম ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন প্রমুখ বরেণ্যব্যক্তিবর্গ ফাউন্ডেশনের মহতি কর্মকান্ডগুলো বাঁচিয়ে রাখার মহান উদ্দেশ্যে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ ও দেন-দরবার শুরু করেন। অতঃপর শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে দেশের আরও কয়েকজন বরেণ্য অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়তায় ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে যাত্রা শুরু করে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন'। তাঁরা বিসিসি ফাউন্ডেশনের স্থগিতপ্রায় কার্যক্রমগুলো এই নতুন সংস্থার তত্ত্বাবধানে এনে আবার সক্রিয় করে তোলেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এইচডিএফ'র কার্মকাণ্ড

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে রয়েছে নিজস্ব কিছু কার্যক্রম, আর অপর ভাগে রয়েছে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ। নিজস্ব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে 'মেধা লালন প্রকল্প' ও 'পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প'।

মেধা লালন প্রকল্প

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত সমাজসেবামূলক প্রকল্পগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'মেধা লালন প্রকল্প'–Talent Assistance Scheme (TAS)। প্রতিবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মান নিয়ে উত্তীর্ণ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রকল্পের অধীনে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া অব্যাহত রাখার নিমিত্তে 'সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ' প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তির পর সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

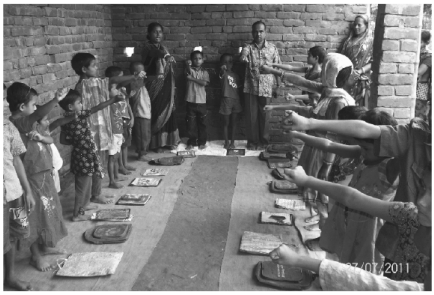

শিক্ষা ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে ফাউন্ডেশন থেকে বই-খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য প্রতিবছর অফেরৎযোগ্য কিছু পরিমাণ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে 'সুদমুক্ত ঋণ' হিসেবে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আপাত অর্থচিন্তাকে সরিয়ে রেখে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করে পরবর্তীতে সুনাগরিক হিসেবে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম করা। এ উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ফাউন্ডেশন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যার প্রভাব তাদের শিক্ষাজীবনে এবং শিক্ষা পরবর্তী কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ফাউন্ডেশন প্রতিবছরই, সে বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মেধালালন প্রকল্পের সদস্যপদ লাভের জন্য দরখাস্ত আহবান করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পে তাদের সদস্যপদ নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, আবেদনকারী যে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিক সে বছরই প্রকল্পভুক্তির জন্য আবেদন করবে।

১৯৮৫ সাল থেকে চালু হয়ে এ পর্যন্ত মোট ১৪১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে শিক্ষাঋণ গ্রহণ করছে। কিছু ড্রপ-আউট বাদে বাকি সদস্যরা তাদের শিক্ষাজীবন সফলভাবে শেষ করে বর্তমানে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কার্যক্রমের মধ্যে 'পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প' অন্যতম একটি। পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা যেন নিয়মিত পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার মাধ্যমে নিজ সমাজ, দেশ সহ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতা, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার, জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়তে ও জানতে পারে এবং জ্ঞানের এই আনন্দময় চর্চার মাধ্যমে আলোকিত ও মুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এ লক্ষ্যে তৎকালীন বিসিসি ফাউন্ডেশন ১৯৮৬ সালে প্রকল্পটি চালু করে। পরবর্তীকালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পরও এটি অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্তির পর পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে ৫ বছর পর্যন্ত বই সরবরাহ করা হয় এবং পাঠাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে লাইব্রেরিয়ানশীপের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রকল্পের অর্জনসমূহ

- এ যাবৎ সুবিধাপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা : ৪৫২
- মেয়াদ পূর্তি স্কুলের সংখ্যা : ৩৫২
- বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত স্কুলের সংখ্যা : ১০০টি
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ১২টি ব্যাচ
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা : ৪৬৮ জন
- এ যাবৎ বিতরণকৃত বইয়ের সংখ্যা : ২১,০৮,০৬২

যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কার্যক্রম

যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কার্যক্রম নির্বাচন করবার বেলায় ফাউন্ডেশন সাধারণত সেই ধরনের বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দেয় যেগুলো অবহেলিত, কিন্তু দেশ ও সমাজের জন্য বিশেষভাবে কল্যাণকর। যেমন বিসিএসআইআর উদ্ভাবিত 'উন্নত চুলা' জনপ্রিয়করণ বিষয়ক কার্যক্রম, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃক্ষ-প্রেম সৃষ্টি তথা সার্বিকভাবে গাছপালা পরিচর্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'নার্সারি প্রকল্প', অবহেলিত কিংবা পরিত্যক্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের পাশে এসে দাঁড়ানো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, সৌরশক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন এবং পঙ্গু ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প, প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা, অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা, নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে তাদের নীতিনির্ধারণী ভূমিকাটিকে জোরদার করা অন্যতম এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পসহ নানাবিধ প্রকল্প হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে আসছে।

আমাদের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা

সানজিদা পারভিন
সদস্য ক/৮৬

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

গানটি গাওয়ার সাথে সাথে আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে একটি উজ্জ্বল দিন। আমরা পিছন ফিরে তাকাই অনুভব করি আমাদের সত্ত্বা, ভিত্তি ও ঐতিহাসিক। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনাতার মূল উৎস। একুশের পথ ধরে এসেছে উনসত্তরের গণ আন্দোলন এবং সবশেষে একাত্তরের গণসংগ্রাম। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা পূর্বের ২১শে ফেব্রুয়ারি আর আজকের ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তখনকার একুশের চেতনার কয়েকটি হচ্ছে আধুনিকতা, বিদ্রোহ, পাকিস্তানে অনাস্থা, স্বাধীনতার স্বপ্ন, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়কিতা, গণতন্ত্রের জন্য আকুলতা ইত্যাদি।

কিন্তু আজ সাঁইত্রিশ বছর পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কি একুশের চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে? দেশের মানুষ আজ নিজস্ব সংস্কৃতি ছেড়ে বিদেশি সংস্কৃতিকে অনুকরণ করছে। আজ নিম্নবিত্তের ভাষা বাংলা, উচ্চবিত্তের ভাষা ইংরেজি আর মধ্যবিত্তের ভাষা ইংরেজি বাংলা খিচুরি। বর্তমানে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা যেটুকু সুস্থ আছি তা ঐ একুশেরই প্রভাব।

বছরে বছরে একুশে এখনও আসছে পুরনো কথাকে স্মরণ করিয়ে দিতে। মনে করিয়ে দিতে '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি রাজপথে রক্ত ঝরেছিল বিপন্ন বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য। প্রাণ দিতে হয়েছিল সালাম, শফিউর, জব্বার ও রফিকদের। ফেব্রুয়ারি এলে সে কথা আমাদের মনে পড়তেই হয়। আজও আমরা একুশে, পত্রপত্রিকায়, সভায়-সমিতিতে সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে এ মাসে তথা এ দিনটিতে অপসংস্কৃতি ছেড়ে তাগিদ না থাকুক তবু বাঙালি হবার চেষ্টা করি।

আমাদের জনজীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি তার উষ্ণতা হারিয়ে আজ হিমশীতল হয়ে পড়েছে। এর চেতনাগত তাৎপর্যকে সুকৌশলে সংকুচিত করে পরিণত করা হয়েছে একুশের উৎসবে। ফেব্রুয়ারি এলে আমাদের একুশের কথা মনে পড়ে। সমাজ ব্যবস্থার প্রাত্যহিক শাসানীতে রুষ্ট আমাদের মন আর্দ্র হয় সাময়িকভাবে। একুশের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল যে জাতীয় পরিচয় ও দর্শন, পাওয়া গিয়েছে যে দিকনির্দেশ, তা সংগঠিতভাবে বাস্তবায়িত করা হয়নি স্বাধীন স্বদেশেও, ফলে আজ জাতীয় জীবনে সংকট হয়েছে আরও জটিল ও ঘনীভূত।

ভাষা আন্দোলনের সাঁইত্রিশ বছর পর একটি স্বাধীন দেশে সর্বস্তরে যথাযথভাবে বাংলা ভাষা চালু হয়নি। আজ '৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে কেউ যদি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দিকে চেয়ে বলেন, বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক পুঁজির কোষে আপাদমস্তক বাঁধা, অতএব পরাধীনতা বা স্বাধীনতা একটি শব্দমাত্র, জাতিগত শোষণ বা নিপীড়নের চেয়েও শতগুণে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত এবং দেশের মধ্যেও নানা স্তরের শোষকশ্রেণি দাঁড়িয়ে গেছে–তবে একটা ভুল বলা হবে না। স্বাধীনাতার পর আবার যখন আমাদের সংস্কৃতি পুনরায় কালো হাতের থাবায় কম্পমান, যখন আমাদের আবার সজাগ হবার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে, তখন ২১শে ফেব্রুয়ারিই তো আমাদের পথ দেখাবে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ছোবল থেকে একুশের চেতনাকে রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তেই আমাদের গণমাধ্যমগুলোর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলব যা জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যুর নামান্তর। পরিশেষে বলতে চাই, ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত একুশে ফেব্রুয়ারির যে তাৎপর্য ছিল তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত একটি দিনের উদ্বোধন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দেশপ্রমিক ও সচেতন নাগরিকের।

নবীন, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯০ থেকে নেওয়া

বিসিএস পরীক্ষা : ১ম পর্ব
লিখিত পরীক্ষায় টিকতে হলে

৩৮তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। এবার লিখিত পরীক্ষার মহারণ। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ছয় কিস্তির ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র। লিখছেন ৩৬তম বিসিএসে অ্যাডমিন ক্যাডারে প্রথম ইসমাইল হোসেন

তুমুল প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যাঁরা উতরে গেছেন, তাঁদের অভিনন্দন। এবার লিখিত পরীক্ষার পালা। প্রিলির মতো লিখিত পরীক্ষা শুধু পাস-ফেলের পরীক্ষা নয়। ভালো নম্বর পেয়ে পাস করার পরীক্ষা। ভালো নম্বর না পেয়ে পাস করা আর ফেল করা প্রায় সমান কথা। ভালো নম্বর তুলতে না পারলে ভালো ক্যাডার পাওয়া যাবে না। বাদ পড়তে পারেন বিসিএস থেকেও। তাই প্রস্তুতিটাও হওয়া চাই যথাযথ।

বাংলাকে হেলাফেলা নয়

বাংলা প্রথম পত্রে বরাদ্দ ১০০ নম্বর। দ্বিতীয় পত্রে আরো ১০০। প্রথম পত্র সাধারণ ও টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের। বাংলা দ্বিতীয় পত্র শুধু সাধারণ ক্যাডারের জন্য। মায়ের ভাষা বলে অনেকেই বাংলাকে হেলাফেলা করেন। হেলাফেলা করলেই সর্বনাশ। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় যেকোনো বিষয়ই গড়ে দিতে পারে বড় ব্যবধান। আর লিখিত পরীক্ষায় বাংলা তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রিলিমিনারিতে যেহেতু টিকেছেন, মেধা নিশ্চয়ই আছে। একটুখানি কৌশল, বাকিটা পরিশ্রম এগিয়ে রাখবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে।

নম্বর বণ্টন

বাংলা প্রথম পত্রে ব্যাকরণ অংশে বরাদ্দ ৩০ নম্বর। প্রশ্ন করা হবে শব্দগঠন, বানান বা বানানের নিয়ম, বাক্যশুদ্ধি বা প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, প্রবাদ-প্রবচন ও বাক্যগঠন থেকে। লিখতে হবে ভাবসম্প্রসারণ ও সারমর্ম। প্রতিটিতে নম্বর বরাদ্দ ২০ করে। বাকি ৩০ নম্বর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। এ অংশে শর্ট টাইপের প্রশ্ন বেশি হতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ লিখন, পত্রলিখন, গ্রন্থ সমালোচনা–প্রতিটিতে ১৫ নম্বর করে মোট ৬০ নম্বর বরাদ্দ। সবচেয়ে বেশি নম্বর রচনা লিখনে। এতে থাকবে ৪০ নম্বর।

সিলেবাস ও প্রশ্ন দেখে প্রস্তুতি

৩৫তম বিসিএস থেকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে নতুন সিলেবাসে। প্রথমেই সিলেবাসে চোখ বুলিয়ে নিন। তারপর নজর দিন বিসিএসে আসা বিগত বছরের প্রশ্নগুলোর দিকে। এতে প্রশ্ন কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন। দশম থেকে ৩৭তম বিসিএসের ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রশ্ন প্রস্তুতিতে কাজে আসবে। বিগত সালের পরীক্ষায় আসা ব্যাকরণ, শুদ্ধিকরণ, প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা, বিভিন্ন ধরনের পত্র লেখার নিয়ম ভালো করে পড়ুন। দরখাস্ত, মানপত্র

বা চিঠি ইত্যাদি লেখার নিয়ম আয়ত্ত করতে পারলে প্রশ্ন যে রকমই হোক না কেন, উত্তর লিখে আসতে পারবেন। বিগত সালে পরীক্ষায় আসা সারমর্ম বা সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণের উত্তর বানিয়ে লেখার অভ্যাস করুন। যত বেশি অনুশীলন করবেন, প্রস্তুতি তত ভালো হবে।

সহায়ক বই

হুমায়ুন আজাদের 'লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী' বইটি পড়তে পারেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে সহজ-সরল ভাষায় লেখা আছে এতে। মাহবুবুল আলমের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইটিও পড়তে পারেন। ব্যাকরণ অংশের জন্য হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর অথবা বাঙলা ভাষার জীবনী' বইটি সহায়ক হবে। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির বোর্ডের বাংলা ব্যাকরণ বই তো আছেই। বাংলা বানান, শুদ্ধিকরণ প্রভৃতির জন্য বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের শেষে 'প্রমিত বাংলা বানান' নামে একটি অধ্যায় আছে। মনোযোগ দিয়ে এই অংশটা দেখলে বানান বিষয়ে ভালো ধারণা পাবেন।

প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

ব্যাকরণ অংশে কিছু টপিকস নির্দিষ্ট আছে। যেমন শব্দগঠন, বানান ও বানানের নিয়ম, বাক্যশুদ্ধি ও প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, প্রবাদের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা ও বাক্যগঠন মনোযোগ দিয়ে পড়লে অল্প সময়ে এর জন্য ভালো প্রস্তুতি নেওয়া যায়। ব্যাকরণ অংশের জন্য কতো নদী সরোবর অথবা বাঙলা ভাষার জীবনী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ভাষা-শিক্ষা, দর্পণ বুঝে বুঝে পড়তে হবে।

ভাবসম্প্রসারণের জন্য দেখতে পারেন সৌমিত্র শেখরের বাংলা দর্পণ ও ভালোমানের আরো দু-একটি বই। সহজ-সুন্দর ভাষায় ২০টি প্রাসঙ্গিক বাক্য লিখলেই চলে ভাবসম্প্রসারণে। উদাহরণ আর উদ্ধৃতি দিলে মান বাড়বে। সারমর্ম লিখতে হবে তিন-চারটি সহজ-সুন্দর বাক্যে।

সাহিত্য অংশটির পরিধি বেশ বড়। পিএসসি নির্ধারিত লেখক সম্পর্কে ভালো করে পড়বেন প্রথমে। তারপর বাছাই করে অন্য লেখকদের সাহিত্যকর্ম দেখবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর লাল নীল দীপাবলী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস–বইগুলো থেকে পড়তে পারেন, অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে। উদ্ধৃতি দিলে এতে নম্বর বেশি পাবেন। গ্রন্থ সম্পর্কে না জানলে বা বইটি না পড়ে থাকলে গ্রন্থ সমালোচনা লিখতে পারবেন না। তাই এই অংশে সময় দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত বইগুলোই পড়বেন।

রচনায় সবচেয়ে বেশি নম্বর

বাংলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ রচনা লিখনে। এতে থাকবে ৪০ নম্বর। রচনা আসতে পারে সমসাময়িক কোনো ইস্যু, জাতীয় সমস্যা ও সমাধান, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে। বাংলা রচনা কতটুকু লিখবেন–এ নিয়ে অনেকের চিন্তার শেষ নেই। অনেকেরই ধারণা, যত বেশি লেখা যায় নম্বর তত বেশি। এটা মোটেই ঠিক নয়। প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়া যদি অযথাই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরাট করে যান, তাতে লাভ হবে না। বরং এটা পরীক্ষকের বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে পারে। রচনা যত বেশি তথ্য-উপাত্তসমৃদ্ধ করতে পারবেন, ততই ভালো। রচনায় ভালো করার জন্য দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় পাতা নিয়মিত পড়লে কাজে দেবে। টপিক ধরে ধরে ফ্রিহ্যান্ড লেখার অভ্যাসও এগিয়ে রাখতে পারে।

ভালো নম্বর পাওয়ার কৌশল

সাহিত্যের প্রশ্নগুলোর উত্তর এককথায় না লিখে তিন বা চারটি বাক্যে লিখুন। প্রথমে সূচনামূলক একটি বাক্য, মাঝে মূল কথা শেষে এককথায় মন্তব্য, এভাবে লিখতে পারেন। ব্যাকরণের প্রশ্নগুলো সামঞ্জস্য বজায় রেখে লিখুন। অতিরিক্ত লিখবেন না। ভাবসম্প্রসারণে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইংরেজি কোটেশন দেওয়া যায়। সারাংশ, সারমর্ম দুর্বোধ্য শব্দে না লিখে সহজ অথচ সাহিত্যরসসমৃদ্ধ শব্দে লিখুন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করুন। ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক পত্রিকার আর্টিকল ও সম্পাদকীয় থেকে বাংলা থেকে ইংরেজি আর ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের চর্চা করলে কাজে আসবে।

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য দিন। লেখকের পরিচয়, গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা বা সমালোচনা, চরিত্রের বর্ণনা, নামকরণের সার্থকতা, গ্রন্থ সম্পর্কে অন্য লেখকদের মন্তব্য, সমাপ্তিসূচক মন্তব্য, এভাবে লিখতে পারেন। কাল্পনিক সংলাপের জন্য পত্রিকার গোলটেবিল বৈঠকগুলোর মিনিটস্, টক শো, গাইড বই থেকে বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে ধারণা নিন। চরিত্র নির্দিষ্ট না করে দিলে তিন-চারটি চরিত্রে সংলাপ লিখুন। গতিশীল সংলাপ লিখুন। এবং সংলাপের শেষে অবশ্যই সমাধানে আসুন।

পত্র, দরখাস্ত, মানপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়মগুলো ঠিক রেখে নিজের ভাষায় লিখুন।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তথ্যবহুল লেখা লিখুন। অল্প কথায় কাজ হলে বেশি লেখার প্রয়োজন কী? লেখার পরিধি গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপস্থাপনা ও তথ্যবহুল সামঞ্জস্যপূর্ণ লেখা বেশি গ্রহণযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ অংশ (তথ্য, উপাত্ত, কবিতার লাইন, বাংলা ও ইংরেজি কোটেশন) রঙিন কালির কলম দিয়ে লিখতে পারেন।

লিখতে হবে নিজের ভাষায়

লিখিত পরীক্ষায় দুই ধরনের প্রশ্ন থাকে। একটি ব্যাখ্যামূলক, যাতে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায় না। যেমন রচনা, ভাবসম্প্রসারণ। আর অন্যটি হলো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন, মানে ব্যাকরণ। এতে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়। ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৪০ নম্বরেই মুখস্থবিদ্যার বালাই নেই। ভাবসম্প্রসারণ, সারমর্ম, বাংলা অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ লিখন, পত্র লিখন, গ্রন্থ সমালোচনা, রচনা লিখন সাধারণত কমন পড়ে না। এতে লিখতে হবে নিজের ভাষায় কিংবা বুঝেশুনে। এগুলো লেখার সাধারণ নিয়মগুলো জানতে হবে। মাথায় রাখতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত। কোনো বিষয়ে ভালো ধারণা থাকলে নিজের মতো করে লিখতে পারবেন।

উপস্থাপনায় জোর দিন

অনেকের উত্তরপত্রে তথ্য কম, একই কথার পুনরাবৃত্তি ও ভুল তথ্য থাকে। এগুলো নম্বর কমিয়ে দেয়। লেখায় থাকতে হবে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সব তথ্য। ভুল বানান ও বাক্য, যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার না থাকলেও নম্বর কম দেন পরীক্ষকরা। নম্বরের সঙ্গে উত্তরের পরিধির সামঞ্জস্য, আপডেট তথ্য থাকতে হবে। হাতের লেখা ও উপস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাতের লেখা সুন্দর হলে ভালো। না হলেও অসুবিধা নেই। আপনি যা লিখছেন তা যেন স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ পরীক্ষক আপনার খাতা পড়তে পারলেই চলবে। লেখায় অতিরিক্ত কাটাকাটি, হাতের লেখা অতিরিক্ত বড় বা ছোটো হলে পরীক্ষক বিরক্ত হতে পারেন। এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন। পরীক্ষা ভালো হবেই।

কালের কণ্ঠ ১৪ মার্চ ২০১৮

আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের জন্য বিদেশি ৫টি জনপ্রিয় স্কলারশিপ!

এইচএসসি পরীক্ষার পর অনেকেরই স্বপ্ন থাকে বিদেশে পড়তে যাওয়ার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষা সমাপ্তির পর মনমত প্রতিষ্ঠানে সুযোগ না পেয়েও অনেকের লক্ষ্য থাকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবাসে পাড়ি জমানোর।

এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সঠিক তথ্যের অভাব। স্নাতক পর্যায়ে ফুলফান্ড স্কলারশিপ পাওয়া বেশ কঠিন, তার উপর সঠিক তথ্যের অভাবে অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তাই লেখাটিতে আলোচনা করা হয়েছে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ পাঁচটি নির্ভরযোগ্য সরকারি বিদেশী বৃত্তি নিয়ে, যেগুলোর সবগুলোই ফুলফান্ডেড এবং সেগুলোর সার্কুলার বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট প্রকাশ করে থাকে।

এবার ঘরে বসেই হবে মডেল টেস্ট! পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথেই চলে আসবে রেজাল্ট, মেরিট পজিশন। সাথে উত্তরপত্রতো থাকছেই!

জাপানের MEXT বৃত্তি

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য জাপান সবসময়ই শিক্ষার্থীদের কাছে অন্যতম পছন্দের একটি নাম। জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃত্তি হচ্ছে 'মনবুকাগাকুশো' স্কলারশিপ, যাকে মেক্সট বৃত্তিও বলা হয়।

এর বিশেষত্ব হচ্ছে এই বৃত্তিতে রয়েছে বিশাল অঙ্কের ভাতা, কিন্তু বৃত্তির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি মিলিয়ে প্রতিবছর সর্বোচ্চ মাত্র দুইশোজন বাংলাদেশি সুযোগ পান! সাধারণত মার্চের শেষে বা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বৃত্তির সার্কুলার প্রকাশিত হয়। আবেদনের খুঁটিনাটি জানতে চলে যাও এই লিঙ্কে :

https://drive.google.com/file/d/0B2bBcoSOOxL_N0dRZGlINlRabU0/view

চীনের সিএসসি বৃত্তি

সিএসসির পূর্ণরূপ হচ্ছে–চাইনিজ স্কলারশিপ সেন্টার, এটি চীন সরকারের বৃত্তি। এর আওতায় আছে আড়াইশো চীনা বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও চারুকলা ইত্যাদি বিষয়ে ফুল ফান্ড বৃত্তি দেওয়া হয়।

অন্যান্য বিদেশি স্কলারশিপের মতো এখানেও বৃত্তি পেতে চাইলে চীনা ভাষায় দক্ষতার সার্টিফিকেট থাকতে হবে! সেটি না থাকলে বৃত্তি পাওয়ার পর তোমাকে চীনে গিয়ে এক বছর বাধ্যতামূলক চীনা ভাষা শিখতে হবে! (বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে চীনা ভাষায়। বিশ্ববাণিজ্যেও চীনারা ক্রমেই শীর্ষস্থান দখল করে নিচ্ছে। তাই চীনা ভাষা একটু কষ্ট করে একবার শিখে নিলে তা সারাজীবন কাজে আসবে)

সার্কুলারের জন্য চলে যাও এই লিঙ্কে

http://www.csc.edu.cn/laihua/

সার্কুলার সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এজন্য একাডেমিক পরীক্ষার সনদ, মার্কশিট, দুটি প্রত্যয়ন পত্র, মেডিকেল সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হলে পুরো ফর্মটি প্রিন্ট করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।

রাশিয়ান সরকারি বৃত্তি

বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমেই মোড়লের আসন পুনরুদ্ধারে এগিয়ে চলেছে রাশিয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অত্যন্ত অগ্রসর এ দেশটির প্রচারবিমুখতার কারণে তাদের সম্পর্কে বাইরের দেশের মানুষের তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। কিন্তু রাশিয়ার সরকারি বৃত্তি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে উন্নত বিশ্বে।

এ বৃত্তিতে ফুলফান্ড পেতে চাইলে একটি জটিলতা রয়েছে–তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে রাশিয়ান ভাষায়! তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই, সরকারি খরচেই মূল কোর্সের আগে সাত মাস রাশিয়ান ভাষা এবং দুই মাস রাশিয়ান সংস্কৃতির ওপর কোর্স করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বৃত্তির আবেদন গৃহীত হলে পড়তে যেতে কেবল বিমান ভাড়া আর খাবারের খরচটা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে; ভিসার খরচ, টিউশন, বাসস্থান সহ সব কিছুর খরচ সরকার বহন করবে! রাশিয়া পৌঁছেই প্রথমে একশো-দেড়শো ডলার দিয়ে স্বাস্থ্য বীমা করিয়ে নিতে হবে। মাসিক খরচ সর্বোচ্চ দেড়শো থেকে আড়াইশো ডলারের মধ্যেই পুষিয়ে যাবে।

স্নাতক পর্যায়ে তুমি সায়েন্স, কমার্স, আর্টসের পনেরটিরও বেশি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। মেডিকেলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেকেই একটি সমস্যার মুখোমুখি হয়–বাংলাদেশের পড়াশোনার ডিগ্রি অনেক দেশে গৃহীত হয় না।

তবে রাশিয়ায় এ সমস্যা নেই। সেখানে মেডিকেলে ছয় বছর মেয়াদী ডিগ্রির নাম 'ডক্টর অব মেডিসিন' (এমডি), যেটি বাংলাদেশের মেডিকেল ও ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক স্বীকৃত।

কীভাবে আবেদন করবে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাইটে সার্কুলার আসে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে। এই লিঙ্কে গিয়ে জেনে নিতে পারো এ সম্পর্কে : http://www.moedu.gov.bd/site/view/moedu_scholarship-archive/Scholarship

সার্কুলারের আবেদন ফর্মে মেডিকেল সার্টিফিকেটের সঙ্গে তোমার সব একাডেমিক সার্টিফিকেট, নম্বরপত্র, জন্মসনদ ও পাসপোর্টের ফটোকপির নোটারাইজড কপি যুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।

সুপারিশকৃত আবেদনকারীরা ঢাকার 'রাশিয়ান সেন্টার অব সায়েন্স অব কালচার'-এ মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। সেখানে পরীক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা দেখা হয় যার ভিত্তিতেই হবে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে–বৃত্তির সার্কুলার প্রকাশের পর আবেদনের সময় থাকে খুব অল্প কিছুদিন, তাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার কেজিএসপি বৃত্তি

এই বৃত্তি পেতে চাইলে তোমাকে বাধ্যতামূলক কোরিয়ান ভাষা শিখতে হবে এক বছর! তবে খরচ নিয়ে সমস্যা নেই, পুরো ব্যয়ভার কোরিয়ান সরকার বহন করবে। তবে একটি শর্ত রয়েছে–এইচএসসি পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৮০% নম্বর পেতে হবে! স্নাতক পর্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সব বিষয়েই আবেদন করা যাবে।

সার্কুলারের জন্য চোখ রাখো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির ভেতর যেকোনো সময় প্রকাশিত হতে পারে সার্কুলার। এই হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের সাইট লিঙ্ক :

http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349

বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের প্রতি কোরিয়ান সরকার বেশ উদার। টিউশন, থাকা-খাওয়া, ভিসার খরচ, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বিষয়ে মিলবে মোটা অঙ্কের ভাতা! শুধু তাই নয়, বছরে একবার দেশে আসা-যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপহার পাবে রাউন্ড ট্রিপ বিমানের ইকোনমি ক্লাস টিকিট!

ভারতের আইসিসিআর বৃত্তি

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিদেশে উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কোনদেশে সবচেয়ে বেশি যায়? পাশের দেশ ভারত! প্রতিবছর ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর কালচারাল রিলেশন্স থেকে সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভারতে পড়তে যায়। কোরিয়ার বৃত্তির মতো এখানেও স্নাতক পর্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যতীত বাকি সব বিষয়েই আবেদন করতে পারবে।

টিউশন ফি সরকার বহন করবে, থাকা-খাওয়ার খরচের ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে সাড়ে দশ হাজার রুপি ভাতা পাবে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা।

আবেদন করতে চাইলে এই লিঙ্কে চলে যাও :

https://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741

সার্কুলার প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে।

ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড ফর্ম নামিয়ে ফর্মটি পূরণ করে সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ, একাডেমিক সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, এইচএসসি সিলেবাস, চরিত্রসনদ ও মেডিকেল সার্টিফিকেট যুক্ত করে একটি পিডিএফ ফাইল বানিয়ে সাবমিট করতে হবে। পাসপোর্ট যদি না থাকে তাহলেও উপায় রয়েছে, আবেদনে 'এপ্লাইড ফর' লিখে সাবমিট করে দাও।

হাই কমিশনকে ফাইলটি মেইলে সাবমিট করার পর তোমাকে লিখিত পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে। সেই পরীক্ষাটি হবে শুধু ইংরেজি ভাষায় তোমার দক্ষতার ওপর।

সার্কুলার প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে

লিখিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। মনে রাখতে হবে–হাই কমিশনকে মেইলে পাঠানো সেই পিডিএফ ফাইলটির হার্ড কপি নিয়ে যেতে হবে ইন্টারভিউতে।

সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় পর আইসিসিআর তোমাকে নির্বাচিত করলে মিলে যাবে বৃত্তি! তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় রয়েছে, অল্প কিছু ভাগ্যবান শিক্ষার্থী নিজের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে, বাকিদের আইসিসিআরের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে পড়তে হবে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে।

সূত্র :10minuteschool.com
২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ফাউন্ডেশন সংবাদ

অভিনন্দন!

ফাউন্ডেশনের জেনারেল বডি'র সম্মানিত সদস্য; বিশিষ্ট সমাজসেবক ও চিকিৎসক অধ্যাপক এ কে আজাদ খান এবছর জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সমাজসেবা' ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদক 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৮' লাভ করেছেন। তার এই বিশেষ সম্মাননা অর্জনে আমরা ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!!

আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অভিনন্দন!

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এবছর বাংলা সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদক 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৮' লাভ করেছেন। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে তাঁর এই বিশেষ সম্মাননা অর্জনে আমরা ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!!

আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রকল্প সংবাদ

‘অধ্যাপক এম. শামসুল হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা’র ফলাফল নির্ধারণ

মেধা লালন প্রকল্পের বর্তমান সদস্যদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০১০-’১১ সালে ‘আলমগীর এম.এ.কবির স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা’, ২০১২-’১৩ সালে ‘ড. আবদুল্লাহ আল-মূতী শরফুদ্দীন স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা’ এবং ২০১৪-’১৫ সালে ‘ড. আব্দুল্লাহ ফারুক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা’র সফল আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭-’১৮ সালে ৪র্থ বারের মতো একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের প্রয়াত সদস্য অধ্যাপক এম. শামসুল হক-এর স্মরণে এবারের প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয়েছিল ‘অধ্যাপক এম. শামসুল হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা’ এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল ‘বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সংকট ও সম্ভাবনা’। বাংলায় ২০০০ শব্দের মধ্যে নিজ হাতে লিখিত রচনা আহ্বানের পর মেধা লালন প্রকল্পের সদস্য ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে ৮৬টি রচনা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত রচনাগুলো যথাযথভাবে যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করেন রচনা মূল্যায়ন কমিটির দুজন সম্মানিত সদস্য যথাক্রমে ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ এবং ড. রওশন আরা ফিরোজ। তাদের দেয়া নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফলে এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন প্রকল্পের ২০১৪ ব্যাচের সদস্য সজীবুর রহমান, সদস্য নং: ১১২৪/২০১৪ (ঢাকা কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত); দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন মোছা: আরিফুন্নাহার অন্ত, সদস্য নং: ৯১৯/২০১১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত); যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে নাছরিন জাহান, সদস্য নং: ৮৬৪/২০১০ (বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত) এবং মো. পাভেল ইসলাম, ১০৬৩/২০১৩ (রংপুর মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত)। উল্লেখ্য, এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার হচ্ছে যথাক্রমে ১০,০০০/-, ৮,০০০/- ও ৫,০০০/- টাকার চেক, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট। রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সকল সদস্যকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন!!

অভিনন্দন

প্রকল্পের ২০০২ ব্যাচের সদস্য গৌতম চন্দ্র সাহা ৩৩তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, মিরপুর-এ ম্যাক্সিলোফেসিয়াল বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বিডিএস সম্পন্ন করেন। গৌতম চন্দ্র সাহা কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৬৩ এবং ২০০৪ সালে নটরডেম কলেজ, ঢাকা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তার এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৩ ছাত্রী

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	মোছা. দিনা আখতার ১০২৫/২০১৩ গ্রাম: কৃষ্ণপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি, এজি, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২.	ফারজানা আফরিন শাপলা ১০২৬/২০১৩ গ্রাম: পান্টি, ডাক: পান্টি, থানা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া।	বিএ, ইংরেজি, ২য় বর্ষ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৩.	মোছা. ফাতেমা বেগম ১০২৭/২০১৩ গ্রাম: রূপসী দোলাপাড়া, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি, ২য় বর্ষ পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ
৪.	হালিমা খাতুন ১০২৮/২০১৩ গ্রাম: আঁচাভূয়া, ডাক: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	এমবিবিএস, ১ম বর্ষ খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।
৫.	জয়শ্রী ঘরামী ১০২৯/২০১৩ গ্রাম ও ডাক: সুতারখালী, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বিএসসি, ১ম বর্ষ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা।
৬.	মোছা. রেশমা বেগম ১০৩০/২০১৩ গ্রাম: নূরপুর, ডাক: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ শাহ আবদুর রউফ কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর।
৭.	মোসা. ফাতেমা খাতুন ১০৩১/২০১৩ গ্রাম: দোষিমানী কাঠাল, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বিবিএ, হিসাববিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
৮.	মোছা. উম্মে সালমা ১০৩২/২০১৩ গ্রাম ও ডাকঘর: সিংগীমারী, থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর।
৯.	মোসা. সাবেরা খাতুন ১০৩৩/২০১৩ ম্যাটস ছাত্রী নিবাস, কুষ্টিয়া	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট, ৩য় বর্ষ ম্যাটস, কুষ্টিয়া।
১০.	মোছা. শামীমা আখতার (রিফা) ১০৩৪/২০১৩ গ্রাম: কৃষ্ণপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি, গণিত, ৩য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
১১.	মোছা. জান্নাতুল ফিরদৌসী ১০৩৫/২০১৩ গ্রাম: পশ্চিম নওদাবাস, ডাক ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস, অর্থনীতি, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১২.	মোছা. সুমাইয়া আক্তার ১০৩৬/২০১৩ গ্রাম: যাদবপুর, ডাকঘর: গোবরা চাঁদপুর, থানা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া।	বিএ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৩য় বর্ষ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১৩.	শাম্মী নাসরিন ১০৩৮/২০১৩ ডাকঘর: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	এমবিবিএস, ১ম বর্ষ খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ, খুলনা।
১৪.	রুকাইয়া ইসলাম (দৃষ্টি) ১০৩৯/২০১৩ গ্রাম: চাওড়াডাঙ্গী, ডাক: বালাগ্রাম, থানা: জলঢাকা, জেলা: নীলফামারী	ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১৫.	ফাহমিদা আক্তার (তন্বী) ১০৪০/২০১৩ মতিঝিল, ঢাকা।	বিএসএস, অর্থনীতি, ১ম বর্ষ, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৩ ছাত্রী

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৬.	মোছা. রেহানা আকতার ১০৪১/২০১৩ গ্রাম: ছোট মির্জাপুর, ডাকঘর: গুর্জিপাড়া, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।	বিএসসি ইন নার্সিং, ২য় বর্ষ শাহ আবদুর রউফ কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর।
১৭.	ইরা কবির ১০৪২/২০১৩ গ্রাম: ডাকবাংলা পাড়া, ডাক: কুড়িগ্রাম, থানা: সদর, জেলা: কুড়িগ্রাম।	এমবিবিএস, ২য় বর্ষ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী ।
১৮.	মোছা. খালেদা খাতুন ১০৪৩/২০১৩ গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএ (পাস), ২য় বর্ষ আলিমুদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।
১৯.	মারিয়া সুলতানা ১০৪৪/২০১৩ ডাক: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বিএসসি, রসায়ন, ২য় বর্ষ বিএল কলেজ, খুলনা।
২০.	লাকী আক্তার ১০৪৫/২০১৩ গ্রাম: টিকাপাড়া, ডাক ও থানা: ঠাকুরগাঁও, জেলা: ঠাকুরগাঁও।	বিএসসি, হোম ইকোনোমিক্স, ২য় বর্ষ ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনোমিক্স, লালমাটিয়া, ঢাকা।
২১.	মোহসিনা সুলতানা ১০৪৬/২০১৩ সাভার, ঢাকা।	বিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২২.	মোছা. সুলতানা বেগম ১০৪৭/২০১৩ গ্রাম: নূরপুর, ডাক: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিবিএ, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২৩.	মোছা. শিমু বেগম ১০৪৮/২০১৩ গ্রাম: নূরপুর, ডাক: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ শাহ আবদুর রউফ কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর।
২৪.	রুবাইয়া আক্তার ১০৪৯/২০১৩ গ্রাম: বেড়াইদেরচালা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	বিএসসি, হোম ইকোনোমিক্স, ২য় বর্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।
২৫.	শামীমা সুলতানা (মুন্নি) ১০৫০/২০১৩ গ্রাম ও ডাক: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট ৪র্থ বর্ষ, ম্যাটস, বাগেরহাট
২৬.	ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ১০৫১/২০১৩ গ্রাম ও ডাক: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট ৪র্থ বর্ষ, ম্যাটস, বাগেরহাট
২৭.	হেলেনা আক্তার ১০৫২/২০১৩ স্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	বিবিএ, মার্কেটিং, ৩য় বর্ষ তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।
২৮.	মোসা. শাইলা সুলতানা রিফাত রঞ্জনা ১০৫৩/২০১৩ গ্রাম: চকতাতীহাটি, ডাক: আলোকছত্র, থানা: গোদাগাড়ী, জেলা: রাজশাহী।	বিএসএস, অর্থনীতি, ২য় বর্ষ রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
২৯.	ইশরাত জাহান (ইরিনা) ১০৫৪/২০১৩ ডাকঘর: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বিএসসি, রসায়ন, ২য় বর্ষ বিএল কলেজ, খুলনা।
৩০.	সুমাইয়া আক্তার ১০৫৫/২০১৩ গ্রাম: গেরিন্ডা বাজার, থানা: রামপাল, জেলা: বাগেরহাট।	বিএ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা।
৩১.	তাহরিমা আক্তার ১০৫৬/২০১৩ গ্রাম: চরশীকান্দার পাড়া, ডাকঘর: ডেফুলীবাড়ী, থানা ও জেলা: জামালপুর।	বিএসসি, প্রাণীবিদ্যা, ২য় বর্ষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

মহাবিশ্বের শেষ সীমানা কোথায়? আদৌ কি আছে?

আমাদের সবার মনের কোণায়ই কখনও না কখনও একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মেরেছে যেটা হলো, আমরা যদি কখনও মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে পৌছাতে পারি তাহলে কী হবে? খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে যেভাবে আমরা মাথা ঝুঁকিয়ে নিচে কি আছে দেখার চেষ্টা করি সেভাবে যদি মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাদের মাথাটা কোথায় থাকবে? তখন তো মাথাটা আর মহাবিশ্বের সীমানার মধ্যে নেই? আমরা কি খুঁজে পাবো মহাবিশ্ব ছাড়িয়ে?

উত্তরটা কিন্তু খুবই হতাশাজনক কারণ আমরা কখনই মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে পৌছাতে পারব না। এর কারণটা কিন্তু এই না যে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে, যদিও কথাটা সত্যি, কিন্তু আসল কারণটা হলো আমরা যদি মহাবিশ্বের বাইরের দিকে একটা সরলরেখা ধরে ক্রমাগত, বিরামহীনভাবে অনন্তকাল ধরে যেতেই থাকি তারপরও আমাদের পক্ষে কখনই মহাবিশ্বের শেষ সীমানায় পৌছানো সম্ভব হবে না। বরং আমরা যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। আর ততক্ষণে হয়তো আমাদের আরেকবার চেষ্টা করার উৎসাহ আর থাকবে না।

কেন পৌছাতে পারব না? কারণ হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্পেসটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো বা মোচড়ানো। যেটা আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে কল্পনা করা সম্ভব না। সহজ করে বলা যায় মহাবিশ্বটা বিশাল এবং নিরন্তর প্রসারিত হচ্ছে এমন কোনো বুদবুদের ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছে না। আমরা যখন বলি যে স্পেস প্রসারিত হচ্ছে আসলে সেটা ভুল। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্টিভেন ওয়াইনবার্গের ভাষায়, 'সৌর জগৎ বা তারকালোকগুলো প্রসারিত হচ্ছে না এবং স্পেস নিজেও প্রসারিত হচ্ছে না বরং তারকালোকগুলো (গ্যালাক্সি) একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।' মহাবিশ্বটা একই সাথে বাউন্ডলেস কিন্তু ফাইনাইট। এটা বোধগম্য করা আমাদের ইনট্যুইশন বা অন্তর্জ্ঞানের জন্যে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। জীববিজ্ঞানী জে.বি.এস হ্যালডেন মজা করে বলেছিলেন, 'মহাবিশ্বটা আসলে আমরা যতখানি ভাবি তার থেকেও বেশি অস্বাভাবিক বা যতখানি আমাদের ইমাজিন করার ক্ষমতা আছে তার থেকেও অনেক বেশি অস্বাভাবিক।'

স্পেসের বক্রতার ব্যাপারটা ব্যখ্যার জন্য একটা উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরুন এমন একজন লোক যে কিনা একটা সমতল পৃথিবীতে বাস করে এবং জীবনেও কখনও কোনো গোল জিনিস দেখেনি। তাকে যদি আমাদের পৃথিবীতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে আমাদের পৃথিবীর শেষ সীমানায় পৌছানোর জন্য হাটা শুরু করে তবে সে কোনোদিনই তা খুঁজে পাবে না। সে হয়তো একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই আবার ফিরে আসবে। এই ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলবে। সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না এটা কীভাবে সম্ভব। আমরাও হচ্ছি আরও উঁচু মাত্রার স্পেসের মধ্যে সেই সমতল-ভূমির হতবুদ্ধি মানুষের মতো।

মহাবিশ্বের যেরকম কোনো স্থান নেই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে বলতে পারব এইটা হচ্ছে এর শেষ সীমা সেরকম কোনো কেন্দ্রও নাই যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারব এইটাই সেই জায়গা যেখান থাকে সব কিছুর শুরু হয়েছিল বা এটাই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবন্দু।

আমাদের জন্য মহাবিশ্বটা ততদূর লম্বা যতদূর পর্যন্ত আলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছে। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, যেটা সম্পর্কে আমরা জানি বা যেটা নিয়ে কথা বলতে পারি, মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন মিলিয়ন (১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) মাইল ব্যাপি বিস্তৃত।এর পরে আরও যা আছে সেটার হিসাব হয়তো সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না।

কীভাবে শুরু হলো বাঙালির বইমেলা?

বইমেলা বইপ্রেমী মানুষের প্রাণে দোলা দেয়, জাতিসত্তার শক্তিবলে লাখ লাখ মানুষকে টেনে আনে একাডেমির প্রাঙ্গণে। আশপাশ ঘিরে জমে ওঠে লেখকদের জমজমাট আড্ডা, কাটে লেখক ও প্রকাশকদের নির্ঘুম রাত। প্রকাশিত হয় হাজার হাজার বই। নতুন বইয়ের মৌ মৌ গন্ধে মোহিত হয় মেলায় আসা পাটক ও দর্শনার্থীরা।

কিন্তু আমরা হয়তো অনেকেই জানি না এই বইমেলার ইতিহাস। কীভাবে শুরু হলো এই বইমেলা? কে বাঙালির এই প্রাণের মেলার প্রারম্ভক? ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বিক্রি শুরু করেন শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একাই বাংলা একাডেমি চত্বরে বইয়ের পসরা নিয়ে বসতেন। ১৯৭৬ সালে অন্যরা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। সেই ৩২টি বইয়ের ক্ষুদ্র মেলা কালানুক্রমে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো বইমেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থান সংকুলান না-হওয়ায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৮০ সালে মেলার স্টল ছিল মাত্র ৩০টি। এখন স্টলের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। প্রতি বছরই মেলার দর্শক, পাঠক ও লেখকের সংখ্যা বাড়ছে।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) কী?

মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা এমআরপি হচ্ছে এমন একটি পাসপোর্ট যাতে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য জলছাপের মাধ্যমে ছবির নিচে লুকায়িত থাকে এবং একইসঙ্গে এতে থাকে একটি 'মেশিন রিডেবল জোন (MRZ)' যা পাসপোর্ট বহনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য, বিবরণী ধারণ করে। MRZ লাইনে লুকায়িত তথ্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট। মেশিনের মাধ্যমে পড়া যায়। ফলে ভ্রমণ ডকুমেন্টের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং MRZ লাইন দ্রুততম সময়ে পড়া যায় ফলে ইমিগ্রেশনে প্রক্রিয়াকরণ সময় কম লাগে। এমআরপি কম্পিউটারে মুদ্রিত।

কীভাবে করবেন এমআরপি?

■ প্রথমে এমআরপি ফরম সংগ্রহ করতে হবে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে অথবা ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করুন। (ওয়েব সাইট http://www.passport.gov.bd/হতে সংগ্রহকৃত/অনলাইনে আবেদনকৃত ফরমটি অবস্যই উভয় পেজে প্রিন্ট করতে হবে)

■ অথবা online এ আবেদন করুন। (শুধুমাত্র নতুন আবেদনের ক্ষেত্রে online পদ্ধতি ব্যবহার করুন)

■ আবেদন ফরম পূরণ করার আগে আবেদনপত্রে উল্লিখিত নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ুন। নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করুন।

■ ব্যাংকে পাসপোর্টের নির্ধারিত ফি প্রদান করে ব্যাংক ভাউচার আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

■ পূরণকৃত ফরম সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে উপস্থিত হয়ে জমা দিন।

কিডনি-তে পাথর জমাট হয়ার কারণ কী? এবং কীভাবে একে নিরাময় করা যায়?

কিডনিতে পাথর হওয়া কিডনির জটিল অসুখগুলোর মধ্যে একটি যেটা আজকাল প্রায় শোনা যায়। কিডনিতে পাথর মূলত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. ক্যালসিয়াম স্টোন ২. ম্যাগনেসিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেট স্টোন ৩. ইউরিক এসিড স্টোন। সাধারণভাবে বলা যায় মূত্রে যদি এসব উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম, অক্সালেট, ইউরিক এসিড ও ইউরেট, সিসটিন ইত্যাদির ঘনত্ব বাড়লে তা কিডনিতে স্টোন এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় অথবা সাইট্রেট, পাইরোফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম কিডনিতে পাথর তৈরিতে বাধা দেয়, এগুলো কমে গেলেও কিডনিতে পাথর হয়। এখন জানা উচিত কখন এসবের ঘনত্ব বেড়ে যেতে পারে– ১. অনেক সময় বিভিন্ন কারণে চিকিৎসকরা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দিয়ে থাকেন, সেই ট্যাবলেট ও ক্যালসিয়ামের লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে, ২. অথবা অনেক সময় আমরা খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমেও অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম অথবা অক্সালেট যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে পারি ৩. কিছু রোগে এমন হতে পারে যেমন টিউবুলার এসিডোসিস ৪. কোন কারণে প্রস্রাবে এসিড ও ক্ষারের ভারসাম্যর মধ্যে তারতম্য হলে ৫. কিডনি থেকে মূত্রথলি পর্যন্ত কোন জায়গায় জীবাণু সংক্রমণ হলে ৬. মানসিক ট্রেস অথবা অজানা কারণেও কিডনিতে পাথর হতে পারে ৭. অন্যতম কারণ হলো পানি কম খেলে। কোনো রোগ নিরাময়ের পূর্বে আগে জানা উচিত কীভাবে প্রতিহত করা যায় আর একবার কিডনিতে স্টোন হলে বার বার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, এই জন্য কিডনিতে পাথর না হওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি হলো– # পানি বেশি বেশি খেতে হবে, কারণ শরীরের মধ্যে জমে থাকা অতিরিক্ত পদার্থ অথবা যে কোনো বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মধ্যে দিয়েই বের হয়, তাই শরীরে যদি এই ক্যালসিয়াম অথবা অক্সালেট এসব পরিমাণে বেশিও হয়ে যায় তাহলে তা বের করে দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে পানি খাওয়া উচিত। * এছাড়া কিডনির পাথর হওয়া প্রতিরোধ করতে কলার খোসা ও পালং শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ কলার খোসাতে যে আক্সালেট অকসিভেজ এবং পালংশাকে যে গ্লাই অক্সিলেট রিডাকটেজ নামে এনজাইম থাকে তা ক্যলসিয়াম আক্সালেট নামক পাথর বা স্টোন জমাতে বাধা সৃষ্টি করে * ভিটামিন সি বেশি আছে, এমন ফলের রস বেশি খেতে হবে। যেমন কমলা, আঙুর ইত্যাদি।* যাদের কিডনিতে বারবার পাথর হয়, তাদের প্রোটিন-জাতীয় খাবার যেমন: মাছ, মাংস ইত্যাদি বেশি গ্রহণ না করাই শ্রেয়।* কোমল পানীয়তে প্রচুর ফসফরিক এসিড থাকে। তাই কোমল পানীয় কম খাওয়া ভালো।* শরীরে কোনো ইনফেকশন হলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে।